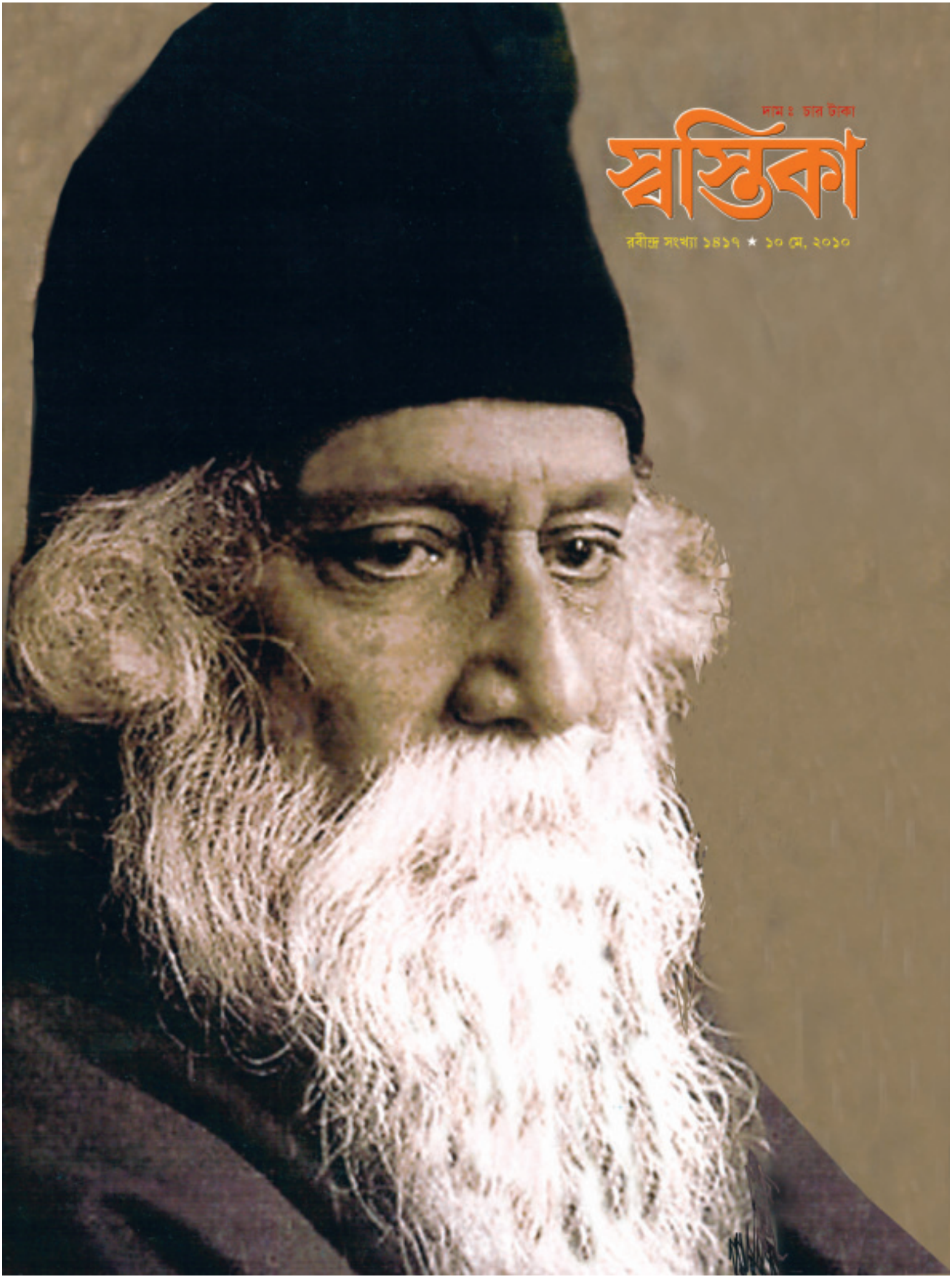

দাম ঃ চার টাকা

স্বস্তিকা

রবীন্দ্র সংখ্যা ১৪১৭ ★ ১০ মে, ২০১০

সূচীপত্র

কবিগুরু ❖ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ● ৬
রবীন্দ্র-রচনায় উপনিষদ ❖ বিজয় আঢ্য ● ৮
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনা ❖ ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ● ১১
রবীন্দ্র-কবিতায় জাতীয়তাবাদ ❖ অচিন্ত্য বিশ্বাস ● ১৫
রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ণ প্রয়াস ❖ ডঃ অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় ● ১৯
তোমার সুরে সুর মেলাতে ❖ নবকুমার ভট্টাচার্য ● ২৩
তুমি কেমন করে.... সুমিত্রা সেনের সাক্ষাৎকার ❖ অর্ণব নাগ ● ২৭

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

স্বস্তিকা

রবীন্দ্রনাথের জন্মসার্ধশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা
৬২ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১২
১০ মে , ২০১০

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

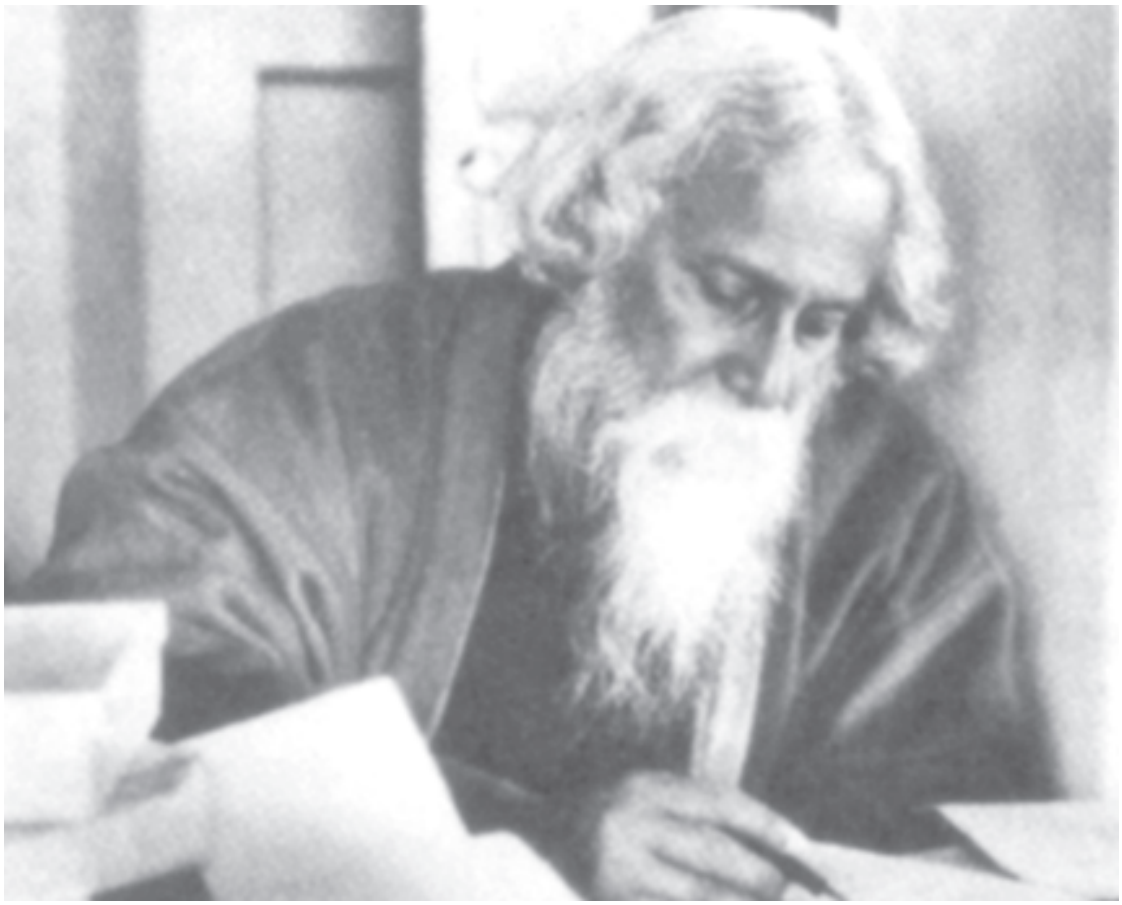

কোনও মহাজাতি কি করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে সেই তপস্যাই তার তপস্যা।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ, তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা— সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করেনি। আমাদের দেশেও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালার ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি।

অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী-ভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয় এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোকদীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড সীমানার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই আমরা ধন্য! আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি, সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।

ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয়নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য করে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন করে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

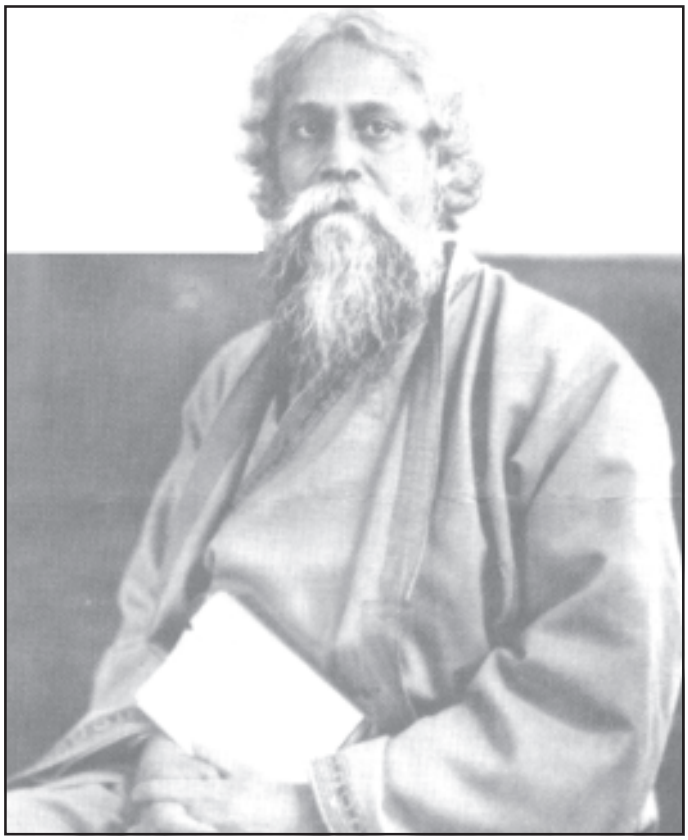

কবিগুরু

ডঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজ ২৫শে বৈশাখ বাংলার ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে কবিগুরুর পুণ্য জন্মতিথি উপস্থিত হইয়াছে। এই ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার দ্বারা আলোকিত করিয়াছেন—এবং তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত অঙ্গুলি অভ্রান্তরূপে কেবল বাংলারই নহে সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ পন্থার প্রতি সঙ্কেত করিয়া গিয়াছে।

আজিকার এই যুগকে "রবীন্দ্র যুগ" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শুধু সাহিত্যই নহে, আমাদের সমগ্র চিন্তাধারা, কল্পনা ও প্রচেষ্টা—সমস্তই তাঁহার মনীষার দ্বারা প্রভাবান্বিত। আজিকার পবিত্র দিবসে সমগ্র জাতি কবিগুরুর ঋণের কথা পরম অভিজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা এমনই এত বিশ্বজনীন যে সে বিষয়ের উল্লেখমাত্রও বাহুল্য। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাকে এই যুগের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

কিন্তু তিনি শুধু কবিই ছিলেন না।

একজন দ্রষ্টার তৃতীয় চক্ষু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অন্তঃদৃষ্টি দিয়া তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের বহু পন্থা দেখিয়াছেন। সঙ্কটের সময় তিনি তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়াছেন এবং যখনই প্রয়োজন আসিয়াছে, তিনি সাধারণ মানুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। কল্পজগতে বিচরণ করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন কঠিন বাস্তববাদী। প্রকৃতপক্ষে এই যুগের তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দার্শনিক ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বিভিন্ন রচনার মধ্যে স্বাধীনতালাভের বহু পূর্বেই তিনি সে সমস্ত সমস্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত রাখিয়া গিয়াছেন। আজ স্বাধীনতা-লাভের পর একে একে সেই সমস্যাগুলি ক্রমান্বয়ে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সম্বন্ধেই আজ আমি কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র উনত্রিশ বৎসর, তখন তিনি রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেন। সেই সময়ে আবেদন নিবেদনের রাজনীতির প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গ -বিভাগ রদ করিবার প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ভুত আন্দোলন দেখা দেয়। তাহার পর বিপ্লববাদী রাজনীতির আবির্ভাব হয়। বাংলা দেশে এই রাজনীতির

আত্মপ্রকাশের ফলে সমগ্র দেশে তাঁহার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ যে আবেদন ও নিবেদনের রাজনীতির বিরোধী ছিলেন, সেই রাজনীতির এইভাবে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাহার পর একে একে আসে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, আগষ্ট-বিপ্লব এবং অবশেষে বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার আবির্ভাব হয়। যদিও দেশের স্বাধীনতা লাভ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি এ কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার আর অধিক বিলম্ব নাই। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে লিখিত "সভ্যতার সঙ্কট" নামে প্রবন্ধে তাঁহার এই উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনের মূল সূত্র হইল আত্ম-প্রত্যয় বা আত্ম-বিশ্বাস। এই আত্ম-বিশ্বাসের নীতি অবলম্বন করিয়াই তিনি সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতায় বাংলাভাষার প্রবর্তন করেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান বুদ্ধি দাতা নেতা ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনিও স্বয়ং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সেই দিনগুলির কথা যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, গান এমন কি কেবলমাত্র উপস্থিতিও যে কি ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করিত, তাহা ভুলিতে পারিবেন না। ইহা অনস্বীকার্য্য যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব হইতে বঞ্চি ত হইলে স্বদেশী আন্দোলন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিত।

ইহার পর তিনি বিশ্ব-মানবতার মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই বিশ্ব-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশবিভাগের অনিবার্য্য পরিণাম স্বরূপ সর্বগ্রাসী সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা বঙ্গ সমাজকে সর্বনাশের সীমান্তে ঠেলিয়া দিয়াছে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এখন একে একে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্রুটিগুলি উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। আমরা বৃটিশকে তাড়াইয়াছি, কিন্তু দেশকে কি আমাদের নিজেদের করিয়া লইতে পারিয়াছি? সম্ভবতঃ পারি নাই, তাহা না হইলে আমাদের স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদের প্রতি আমাদের ব্যবহার অন্য প্রকার হইত। ইহার প্রতিকার কি? সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার কথা বহু পূর্বেই তাঁহার মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি বহুকাল পূর্বে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"যদি এমন একদিন আসে, যেদিন ভারতীয় ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে বৃটিশরা তাহাদের বিদায়ের সময়ে তাহাদের শাসনের ভগ্নস্তূপের উপর এমন কোটি কোটি মানুষকে রাখিয়া চলিয়া যায়, যাহাদের আত্ম-বিশ্বাস নাই, যাহারা নিজেদের আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম, যাহারা নিজেরে কল্যাণ সাধন করিতে অপারগ, তখন আমরা আমাদের চিরন্তন দারিদ্র্য ও সীমাহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে দায়ী করিব? ইহা কি তবে ভাগ্যের লিখন যে ভারতবাসী সর্বদাই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত থাকিবে এবং সকলের কল্যাণের স্বার্থে কখনও একতাবদ্ধ হইবে না?" কবিগুরু তাঁহার তৃতীয় নেত্র দিয়া যে অবস্থা উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান অবস্থা কি তাহারই অনুরূপ নহে? আমরা কি আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অন্যের উপর এবং পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতেছি না। নিজেদের কল্যাণে সে সহযোগিতার পরিবেশ কি বাস্তব হইয়া উঠিতেছে? এই অবস্থার প্রধান কারণ এই যে দেশ আমাদের নিকট বাস্তব হইয়া উঠে নাই এবং আজ ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় আমরা এতই ব্যস্ত যে দেশের প্রতি দৃষ্টি দিবার আমাদের অবসর নাই। রবীন্দ্রনাথ দেশ ও দেশের কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে এ সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করিয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বৃটিশরা চলিয়া গেলে কি ঘটিবে এবং তাই তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"দেশের কল্যাণ বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কল্পনা থাকা দরকার। এই কল্পনাটিকে একান্ত বাহুল্যপূর্ণ ও ক্ষুদ্র অর্থে গ্রহণ করিয়া আমরা শুধু নিজেদের দুর্বলই করিতেছি। এইজন্যই আমি মনে করি যে দেশকে যদি আমরা স্বরাজ্যের প্রকৃত 'সাধনা'য় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের স্ব-রাজ্যকে তাহার সামগ্রিক অর্থে উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা কি সামগ্রিক অর্থে স্বরাজ্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি? আমাদের সমস্ত দৃষ্টি কি শাসন-যন্ত্রের স্থানটির উপর আটকাইয়া যায় নাই? এবং যেখানে প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশ বিরাজ করে, সেখানে আমাদের চরম উপেক্ষা আমাদের সম্পূর্ণ অধঃপাত ও সমগ্র দেশকেই সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে না? দেশের প্রকৃত বাস কোথায় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কিঞ্চি ৎ মাত্রও সংশয় ছিল না, তাঁহার রচনা সমূহ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রাণকেন্দ্র গ্রামের উন্নয়ন ও গ্রামবাসীদের উন্নতির মধ্যেই "স্ব-রাজ্য সাধনার' সার্থকতা নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ যে সাধনার প্রতি সুস্পষ্ট সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন, সেই গ্রাম-ভারতের চরম উপেক্ষার ফলে স্বরাজ্যের সাধনা আজ এক ব্যর্থতার করুণ কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

বর্তমান অবস্থার কারণ এই যে, আমাদের এখনও পর্য্যন্ত আত্ম-প্রত্যয়ের নীতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয় নাই, যে নীতির প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং ইহাই তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার কেন্দ্র বিন্দু। এই আস্থা সৃষ্টি না হওয়ার ফলেই আমরা আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি দিই নাই, যে জনসাধারণ আমাদের শক্তির প্রকৃত উৎস ও ভাণ্ডার। দেশের কল্যাণে যে তপস্যা প্রয়োজন, তাহাতে আমরা আত্মনিয়োগ করি নাই। আমরা নিজেদের প্রতি অবহেলা করিয়াছি এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। এই বিশ্বাসঘাতকতা আজিকার প্রত্যেক কাজ ও প্রচেষ্টার মধ্যে পদে পদে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'সত্য কথা এই যে আমরা ইহা আমাদের সেবা, স্বার্থত্যাগ, তপস্যা জ্ঞান ও সহানুভূতির দ্বারা লইতে পারি নাই—এ দেশে আমরা ঘটনাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

আর কোনও দেশে কি কোনও দার্শনিক কবি পূবর্ব হইতেই এমন সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন?—এবং আর কোনও দেশ কি কখনও এই সতর্কবাণী এমন ভাবে উপেক্ষা করিয়াছে? এখনও সময় হাতছাড়া হয় নাই। কবিগুরুর বাণী যেন আমাদের সদ্‌বুদ্ধি কে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে যাহাতে আমরা নিজেদের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া বৃটিশ শাসনের অবসানের ফলে যে স্বাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছে, সেই স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারি।

(উনিশ শো সাতান্ন সালের পঁচিশে বৈশাখে কবিগুরুর নববুইতম জন্মদিবস উপলক্ষে সিনেট হলে অনুষ্ঠিত সভায় শ্যামাপ্রসাদের সভাপতির অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃ ত)।

রবীন্দ্র-রচনায় উপনিষদ

বিজয় আঢ্য

অতুলনীয় রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে আমরা কবিগুরু, বিশ্বকবি ইত্যাদি বলে শ্রদ্ধা জানাই, কিন্তু তা বোধ হয় যথেষ্ট নয়। তিনি একাধারে মহাকবি, দার্শনিক, নাট্যকার, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রকর, শিক্ষাবিদ, আদর্শ শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা। অলঙ্কার শাস্ত্রে 'অনন্বয়' নামে এক অলংকার আছে যেখানে উপমেয়কে শুধু উপমেয়র সঙ্গেই তুলনা করা হয়, অন্য তুল্যমূল্য উপাদানের অভাবে। যেমন—

গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপম
রামরাবণয়োঃ যুদ্ধ রামরাবণয়োরিব॥

গগন গগনের মতো, সাগর সাগরের মতো এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধের মতো। তাই রবীন্দ্রনাথ কার মতো বলতে গেলে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতো।

রবীন্দ্রনাথের জীবন পরিধি (১৮৬১-১৯৪০) ঊনিশ শতকের শেষার্দ্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশে তখন নতুন করে উপনিষদ চর্চা শুরু হয়েছে। খৃষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচয় ও ইংরাজি শিক্ষার ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের আকর্ষণ শিথিল হচ্ছে। এই যুগপরিবেশে রামমোহন রায় বিগ্রহবর্জিত উপাসনা-রীতির সন্ধানে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙালীকে উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য তিনি পাঁচটি ছোট উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য) বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মধর্মের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর সাধন-জীবনের আরম্ভই হয় 'ঈশ' উপনিষদের প্রথম পংক্তি নিয়ে (ঈশাবাস্যমিদং সর্বং)। বিশ্বশক্তি বিশ্বের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে—এই হলো উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মূল সুর। ব্রহ্ম সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, ব্রহ্ম সব কিছু ধারণ করে আছেন এবং সব কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠান করছেন—উপনিষদের নানা বাণীতে এই কথাই বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

পৈতৃক সূত্রে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য তথা উপনিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। যদিও তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণভীতি ছিল। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি নিজেই লিখেছেন—''অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলো এবং ব্যোপদেবের সূত্র দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধহয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।" বালক রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 'ব্রাহ্মধর্ম'-এ সংকলিত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে রবীন্দ্রনাথকে আবৃত্তি করাতেন। হিমালয় ভ্রমণকালে বারো বছরের বালক রবীন্দ্রনাথকে সূর্যোদয়ের আগেই বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করতে হোত। অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর 'সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন—" উপনিষদের শ্রুতিগুলি রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে—একথা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপনিষদের উদ্ধৃতি ও আলোচনা এত প্রসারিত যে, শুধু এই বিষয়েই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হতে পারে। অনেক বিদ্বান ব্যক্তি রবীন্দ্রমানসের গঠনে উপনিষদের সম্পর্ক গ্রন্থরচনা করেছেন, নানাবিধ বিচার-বিশ্লেষণও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যে, বিশেষতঃ ধর্মবিষয়ক রচনায়, উপনিষদের অজস্র বাণী ধ্বনিত হয়েছে।" বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ ভাবনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'শান্তিনিকেতন,' 'ধর্ম', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গদ্য রচনাবলী গভীরভাবে আলোচনা করতে হয়।

উপনিষদের ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তরসের উপাসক। উপনিষদের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন—

'শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। (২।৫)
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥ (৩।৮)

ঋষির এই দিব্যচেতনা ও দিব্যানুভূতি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। 'নৈবেদ্য'-এ তিনি লিখেছেন—

'একদা এ ভারতের কোন বনতলে
কে তুমি-মহান প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙিঘতে পার, অন্য পথ নাহি।'

—এই পংক্তিগুলি যেন শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের আক্ষরিক অনুবাদ।

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের ৬।৮ মন্ত্রটি লক্ষ্য করা যেতে পারে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ (৬।৮)

কবি যে সমগ্র বিশ্বকে তার অখণ্ডরূপে দেখেন তা স্পষ্টই বলেছেন—

"আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে একান্ত সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন।"

ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রটি তাঁর বহু কবিতার উপজীব্য সেই মন্ত্রটি হলো—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ (১৫)

'জন্মদিনে' কাব্যে কবির লেখনীতে সেই মন্ত্রের অভিব্যক্তি—

"হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত। (জন্মদিনে, ২৩)

যে আনন্দ অমৃতের কথা মুণ্ডক উপনিষদে দেখি—

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাবি (২।৮)

তারই অনুকৃতি দেখি 'রোগশয্যা' কাব্যে—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ। (২৫)

আবার—

"এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ-অমৃতরূপে—" (রোগশয্যায়, ২৮)
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে। (আরোগ্য, ৩২)

রবীন্দ্রনাথের রচনায়, বিশেষত প্রবন্ধে উপনিষদের প্রভাব খুব বেশি। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'প্রার্থনা' প্রবন্ধে বলেছেন—'উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি।' ঈশ উপনিষদের পঞ্চ ম মন্ত্র—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

এই মন্ত্রটির অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-এর 'ওঁ' প্রবন্ধে—'অর্থাৎ চলা না চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির, সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি, কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্য তিনি ওঁ।'

আবার 'নৈবেদ্য'-র কবিতায় এই মন্ত্রটির কবিকৃত অনুবাদ—

'হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম,
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।
কাছে তুমি নানাভাবে নিত্য নব নব
সুখদুঃখ জনমে মরণে!'

কঠোপনিষদ-এর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ২৩ তম মন্ত্র—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে এই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি দেখি—"বহুবিধ বিষয় পঠনের ব্যবস্থা করিলে যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি।"

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্র বা শ্রুতি—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
ততোরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

মন্ত্রটির সরল অর্থ—সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুটি পাখি একই গাছকে আশ্রয় করে রয়েছে। ওদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল (কর্মফল) খাচ্ছে আর অন্যটি না খেয়ে তাকিয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'মন্দির' প্রবন্ধে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন—"জীবাত্মা পরমাত্মার ঐরূপ সাজুয্য, ঐরূপ সারূপ্য, ঐরূপ আলোক্য, এত অনায়াসে এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের

সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই।"

মণ্ডুক উপনিষদের তৃতীয় মণ্ডুকের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ মন্ত্র—'সত্যমেব জয়তে নানৃতং...।' 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধে মন্ত্রটির রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা—"যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একবারেই সত্যকে দেখিতে পান।...তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন ঃ সত্যমেব জয়তে।" সত্যের পূজারী সেই 'বড়ো'-দের বিষয়ে শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে কবির আরও বক্তব্য—"ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে? তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন। ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুবাকে বলা হয়েছে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যাভিমংবিশন্তি।" এই শ্রুতিটি সম্বন্ধে কবির উপলব্ধি—'জগতের ভিতরকার একটা অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে বিচ্ছিন্নভাবে যদি দেখি তবে তার যথার্থ কোন অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই—তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে ঃ আনন্দাদ্ধ্যেব—অভিসংবিশন্তি। একথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার জো নেই।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডের শ্রুতি-তে শিষ্য নারদ গুরু সনৎকুমারকে বলছেন—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি'।—যা ভূমা তাই সুখ। অল্পে সুখ নেই। তাই ভূমাকে জানতে ইচ্ছা করি। 'ভূমা' (শান্তিনিকেতন) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে 'আমার সব পাওয়া হলো।' অতএব যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়ো, তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখ নিবৃত্তিতে নয়।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ আছে। গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করার আগে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর বিষয় সম্পত্তি দুই স্ত্রীর (মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী) মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলে মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—'যেনাহং নামৃতং স্যাং কিমহং তেন কুর্যামঃ...।' শান্তিনিকেতনের 'প্রার্থনা' প্রবন্ধে মহর্ষি পত্নীর এই উক্তিতে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট কী মধুর হয়ে উঠেছে। সমস্ত মানব হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুল কণ্ঠে চিরকালের জন্য বাণী লাভ করেছে। উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি, কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি।'

উপনিষদকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে স্বদেশের উদ্দেশ্যে বলেছেন—"হে ভারতবর্ষ, তুমি যাহা হইবে, যাহা করিবে, অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই। তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলে চেয়ে মহৎ।...আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের কি কর্মের কি ধর্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে, এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশ্রান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইয়ো না, ক্ষুব্ধ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না। তুমি

আত্মানং বিদ্ধি।

আপনাকে জানো।

এবং 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরাস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া পথস্তাৎ কবয়ঃ বদন্তি।।

ওঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও। যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধার শাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।"

ভারতের ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টিতে যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রামাণ্য উপনিষদগুলিতে সেই সব শাশ্বত সত্যই বিবৃত রয়েছে। রবীন্দ্রমানসে উপনিষদের প্রভাবে যে কত গভীর এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই তার আভাষ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ধারাবাহিক ব্যাখা করেননি। ঋষিদের উপলব্ধিজাত এই সব বাণীর উপর স্থলবিশেষে নতুন আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজোর মতোই উপনিষদের আধুনিক ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর বাণী উদ্ধৃত করেই নিবন্ধটির ইতি টানছি।

"ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দ রূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।"

তথ্যসূত্র ঃ

১। রবীন্দ্ররচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

২। উপনিষৎ নবক—অতুলচন্দ্র সেন

৩। সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ—সুখময় ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনা

ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

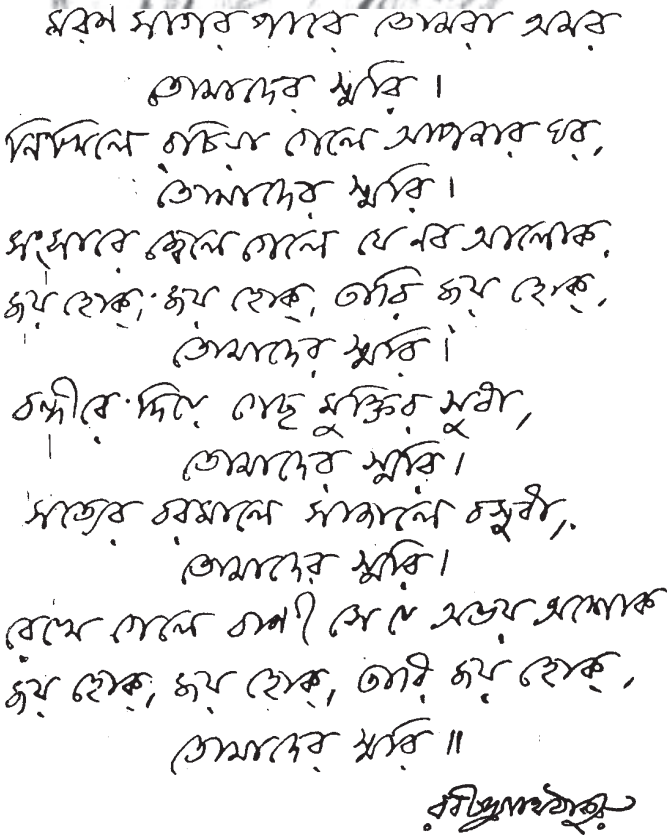

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশভাবনা' কোনও ইজম্-এর তত্ত্বোপলব্ধির মধ্যে নিহিত নয়। আত্মোপলব্ধির উৎসমুখে উৎসারিত সত্যের ওপরেই তাঁর স্বদেশ চেতনা ও স্বদেশভাবনার প্রতিষ্ঠা। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তাঁর সেই উপলব্ধি সত্যকে প্রকাশ করেছেন, 'দেশ আমারই আত্মা, এই জন্যই দেশ আমার প্রিয়'। এই সত্যোপলব্ধির অনুবর্তী হয়েই তিনি ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ'-বিরোধী আন্দোলনপর্বে বলেছেন, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক্ থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' এই আত্মোপলব্ধির সহায়ক পরিবেশ-বান্ধবের একান্ত শৈশবেই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাঁর পারিবারিক সংস্থান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' সেই পারিবারিক সংস্থানের প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সংগীত, 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" তাঁর এই স্বদেশানুরাগ কিন্তু কখনই উগ্র ভাবনার মূঢ়তায় কবলিত হয়নি। দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে বিদেশের ভালোকে

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনি নির্বোধের মতো নির্বিচারে বর্জন করেননি। এইখানেই তাঁর আত্মোপলব্ধির বিশিষ্টতা। অর্থাৎ তাঁর জাতীয়তাবোধ কখনই সংকীর্ণতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি—তাঁর জাতীয়তাবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের কবলিত হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত তাঁর সেই ভাবনার ফসল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনি স্বদেশী শিল্পের প্রতি প্রীতির আধিক্যে বিদেশী পণ্যের বর্জনও বহ্নুৎসবকে সমর্থন করেননি। এই মূঢ় ভাবনার বিরোধিতাও করেছেন। উগ্র দেশসাধনার স্বরূপ তিনি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লুণ্ঠন, অত্যাচার, হীন জাতিবিদ্বেষ, বিলিতি পণ্য বর্জন, পিকেটিং, বিলিতি বস্ত্র প্রজ্জ্বলন প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে। বিলিতি বস্ত্র দাহনের উন্মত্ততায় পঞ্চু র মতো ছোটখাটো ব্যবসায়ীর ওপর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বদেশভাবনায় মনুষ্যত্ববর্জিত অবিবেচনা, বিবেকহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকেই পরিস্ফুট করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বদেশভাবনার মধ্যে থাকবে কল্যাণকামিতা। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে কল্যাণকেই ধর্মের ফলিত রূপ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন। তাই এই উপন্যাসের ঘটনাক্রমের মধ্যে দেখিয়েছেন অকল্যাণকর কাজই ধর্মদ্রোহিতা। নিখিলেশের কাছারিতে ডাকাতি হবার খবর পেয়ে তার রাজনৈতিক ধর্মগুরু মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু বেদনাহত কণ্ঠে বলেছেন, ''আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি, এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধ ত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনও লজ্জা থাকবে না।' চন্দ্রনাথবাবু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনারই প্রবক্তা। কল্যাণকামিতা ও মঙ্গলবোধ যার প্রাণ।

'গোরা' উপন্যাসে তাঁর এই স্বদেশভাবনা আরও স্পষ্ট, প্রসারিত এবং অর্থবহ হয়ে উঠেছে। গোরাকে তিনি যথার্থ জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক হিসাবে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী দেশবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছেন। স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবর্জিত মানব প্রেম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদকে সমন্বিত করে গোরার ভাবনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন—যা তাঁরই ভাবনার দোসর। দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার আগে 'গোরা' উপন্যাসে প্রতিফলিত তার উপলব্ধি স্বদেশ ভাবনায় উজ্জীবিত করাই আশু প্রয়োজন বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন এবং গোরা সেই বিশ্বাস বোধেরই বাহক। রবীন্দ্রভাবনাশ্রিত গোরার বিবেচনায় তাই রাজনৈতিক পরাধীনতা অপেক্ষা বিদেশী ধর্ম-সংস্কৃতির অধীনতা বেশি ক্ষতিকারক যা জাতির স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করে, স্বদেশ চেতনাকে গ্রাস করে। গোরার ভাবনায় ভারতবাসী হয়ে ওঠার সাধনাই রবীন্দ্রভাবনার যথার্থ স্বাদেশিকতা—'আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।' এই সত্যোপলব্ধিই হলো রবীন্দ্রভাবনার যথার্থ স্বদেশভাবনা। এই ভাবনার ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই গোরার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলার অধিকার জন্মাবে, 'সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করেছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই—আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিকতার ভারতবর্ষ।'

গোরা যে দেশমাতৃকাকে ভালোবেসেছে তারই চিন্ময়ী রূপকে রবীন্দ্রনাথ তার গানের ভিতর দিয়ে দেখেছেন;

অয়ি ভুবন—মনোমোহিনী
অয়ি নির্মল—সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী—জননী।

দেশমাতৃকার সেই রূপমূর্তিতে তিনি বিমোহিত—'ওগো মা-/তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।' দেশমাতৃকার অতুল রূপবৈভবের তিনি বর্ণনা দিয়েছেন, 'তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।/তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে/সোনার মন্দিরে।' এই দেশমাতৃকাকে তিনি' রক্ষা করার সর্বকালীন মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন তাঁর স্বদেশবাসীকে—'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক/আমি তোমায় ছাড়বো না, মা''/এবং তার জন্য স্বদেশপ্রাণ সন্তানের মাতৃসম্মান রক্ষায় আত্মোৎসর্গে অঙ্গীকারবদ্ধ তা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে;'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,/তবে এক্‌লা চলো রে।'

তাঁর ভাষা ভাবনাতেও সেই 'মুক্ত' স্বদেশপ্রাণতা পরিস্ফুট হয়েছে। 'মুক্ত স্বদেশপ্রাণতা অর্থে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেও ইংরেজি ভাষার আবশ্যিকতাকে সংকীর্ণ স্বদেশচেতনায় অগ্রাহ্য না করা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ'-এর অপরিহার্যতার সঙ্গে তুলনা করেও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর 'ছাত্র মুলু' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'এখানকার বিদ্যালয়ে আমি যখন ইংরেজি শিখাইবার ভার লইলাম, তখন এই মত অনুসারে আমি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পঞ্চ ম, চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার দায়িত্ব আমার হাতে আসিল। তৃতীয় শ্রেণীতে আমি যে-সকল ইংরেজি রচনা পড়াইতে সুরু করিলাম, তাহা সাধারণত কলেজে পড়ানো হইয়া থাকে।'—স্বভাষার প্রতি প্রীতির পারবশ্যে তিনি স্বদেশবাসীর ইষ্টকে কখনই বিনিময় করেননি। তাই তিনি বিশ্বের জ্ঞানের আধার ইংরেজি ভাষাকে মূঢ় চিন্তার কবলিত হতে দেননি। এই জ্ঞানচর্চার ইংরেজকেই তিনি তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে 'বড় ইংরেজ' বলেছেন। পশ্চি মবাসী এই বড় ইংরেজের জন্যই তিনি স্বদেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছেন তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায়,—'পশ্চি মে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,/দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—/এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার মধ্যে যেমন উগ্রতা নেই তেমনি সংকীর্ণতাও নেই। ঔপনিষদিক বিশ্বাত্মবোধের ভাবনায় তার স্বদেশভাবনা জারিত।

রবীন্দ্র-কবিতায় জাতীয়তাবাদ

অচিন্ত্য বিশ্বাস

২৭ আগস্ট ১৯০৪, গিরিডি থেকে রবীন্দ্রনাথ দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)-কে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে 'শিবাজী উৎসব' সম্পর্কে সংবাদ আছে। 'শিবাজী উৎসব' সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২)-এর অনুরোধে লেখা। বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭-১৯২০)-প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব বাংলায় পত্তন করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর, সেটি ১৩১০ সাল। সে-বৎসর দেউস্কর একটি প্রবন্ধ লেখেন 'শিবাজীর মহত্ব'। ২০ পৃষ্ঠার সেই প্রবন্ধ শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ দীনেশ বাবুকে লিখছেন—'দেউস্কর মহাশয়ের বৈদ্যুত তাড়নায়'—'শিবাজী উৎসব' লিখিত হয়। ১১ ভাদ্র ১৩১১-র সেই কবিতা ছাপিয়ে 'শিবাজী উৎসব'-এ একই ভাবে বিতরণের ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে দেউস্করের একটি ছোট প্রবন্ধ 'শিবাজীর দীক্ষা'—সেটি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৪-এ রচিত। 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৪, সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)। 'শিবাজী উৎসব' বেশ গুরুত্বপূর্ণ কবিতা, ভারত-ইতিহাসের এই রবীন্দ্র-ভাষ্য, 'বঙ্গদর্শন' আর 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কবিতাটির বিচার, রবীন্দ্রনাথের আদর্শটি বুঝে

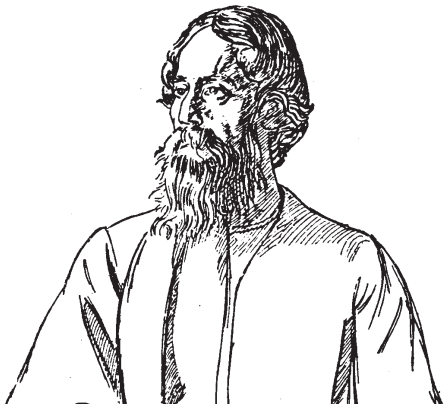

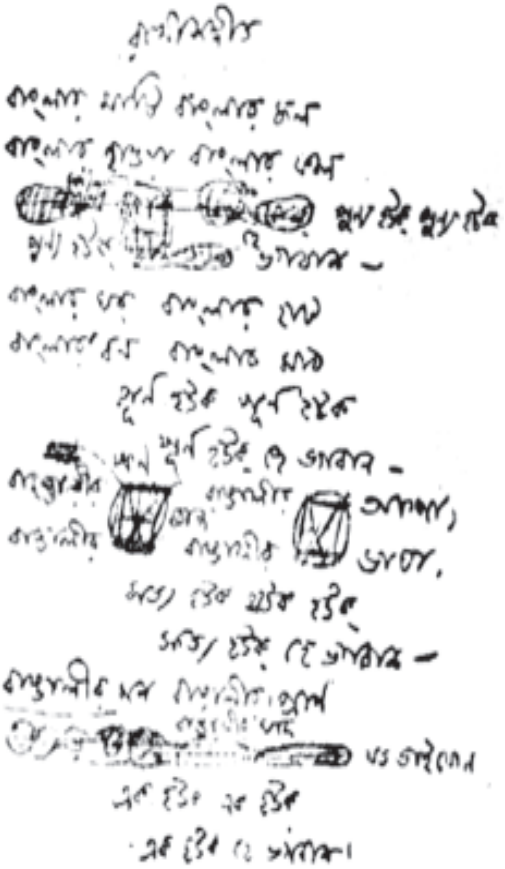

নেওয়ার জন্য যথেষ্ট জরুরী।

ঐ কবিতায় শিবাজীর রাজনীতিকে রবীন্দ্রনাথ নতুন দৃষ্টিতে ধরতে চেয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলার পশ্চিমাংশে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। বাংলার মানুষ সেই হাঙ্গামার কথা ছড়া - কিংবদন্তী - জনশ্রুতি-কাব্যকথায় মনে রেখেছে। যৌথ-সরদেশমুখী সংগ্রহের জন্য বর্গীর দলের আক্রমণ পেশোয়াদের সময়ে সংগঠিত হয়—সাধারণ মানুষ এই আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। গঙ্গারাম দত্ত ঐ নিয়ে লিখেছেন ঐতিহাসিক গাথা 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার লিখেছিলেন একটি চম্পুকাব্য। বাংলা ভাস্কর পণ্ডিত রঘুজী ভোঁসলেদের অভিযানকে আদর্শায়িত করেনি। রবীন্দ্রনাথ এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ সন্ধান করেছেন। বস্তুত এ হলো স্ব-সময়ের চাহিদামত পূর্বতর সময়কে পুনর্গঠন। এর পিছনে কাজ করেছে নতুন এক ইতিহাস বোধ। রবীন্দ্রনাথ বর্গীর হাঙ্গামাকে নতুন এক দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন ১৯০৪-এ। তাঁর ভাষা— 'তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি হে রাজন,/তুমি মহারাজ।/তব রাজকর লয়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন/দাঁড়াইবে আজ।' নতুন আদর্শবোধে উদ্দীপিত রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল—ভাস্বর হয়েছেন

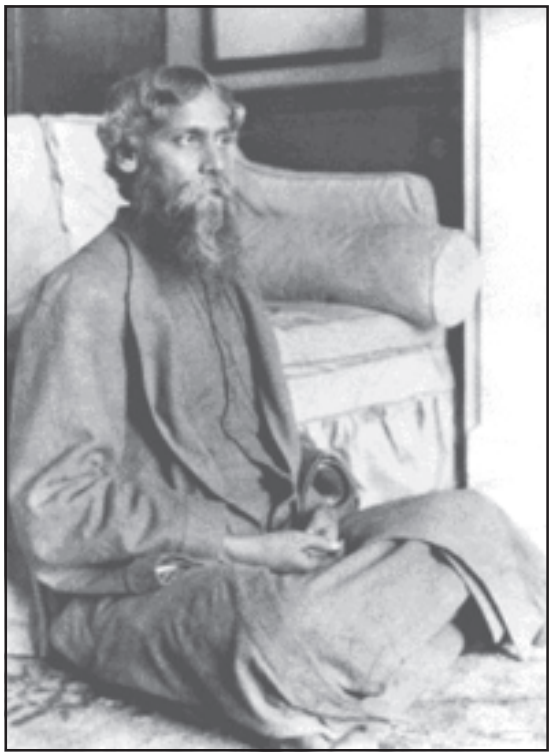

এইভাবে। এই আদর্শবোধ শিবাজীর রাজনীতি ও সংগ্রামকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার অবকাশ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বাঙালী সেদিন শিবাজীকে চেনেনি।—'সেদিন এ-বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে/পায়নি সংবাদ।'

—আজও আচ্ছন্ন রয়েছে দৃষ্টি। কারণ আমরা পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের ভাবনার শৃঙ্খলে বন্দী। 'বিদেশীর ইতিবৃত্ত' শিবাজীকে 'দস্যু বলি করে পরিহাস'। আসলে রবীন্দ্র-চেতনায় শিবাজী সম্পর্কিত ভাবনা, বাঙালীর চোখে দুটি কারণে আচ্ছন্ন ছিল।

১. শিবাজীর আন্দোলন—জাতীয় আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবন, বাঙালী সে সংবাদ সময়মতো পায় নি। আর

২. বাঙালী পাশ্চাত্য ইতিহাস-বিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগে মধ্যবিত্ত বাঙালীর অনীহা আর সাহেব-প্রীতি এর কারণ। দ্বিতীয় কারণটি রবীন্দ্রনাথ নানা লেখায় সনাক্ত করেছেন, সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। 'মানসী'-র 'বঙ্গবীর' এরকম কবিতা। এর ভুলুবাবু 'হিষ্ট্রি-কেতাব লইয়া করেতে/কেদারা হেলান দিয়ে' মুখস্থ করেছে; সেই পশ্চিমা ইতিহাস গিলতে গিলতেই তার মনে হয়েছে এতেই দেশোদ্ধার হবে।

বিদেশী ঐতিহাসিক যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথ শিবাজীকে ভারতীয় জাতীয়তার মহান যুগপুরুষ বলে মনে করতেন। এনিয়ে বর্তমান লেখকের একটি বইয়ের একাংশ উল্লেখ করছিঃ 'কেউ কেউ মনে করেন "শিবাজী প্রতিভাশালী দস্যু মাত্র"।' একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। তিনি মনে করেন, তা যদি হত তাহলে "সেই দস্যুতাকে অবলম্বন" করে "সমস্ত মারাঠা জাতি এক" হয়ে উঠতে পারত না।' ('রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা' ঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস;বৃন্দবাক, কলকাতা; ১৯৯৯;৩৬ পৃ.)। 'শিবাজী উৎসবে' আছে শিবাজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ঃ 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত/ বেঁধে'-দেওয়ার। এই আকাঙ্ক্ষায় সত্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যা সত্য তা চিরন্তন। শিবাজীর 'প্রাণোৎসর্গ' তাই 'চিরযুগ যুগান্তর-তরে ভারতের ধন।' পশ্চিমা ইতিহাস থেকে নয়—ঐ ইতিহাসবোধ দেশজ—কবির উপলব্ধি সঞ্জাত, ধ্যানলব্ধ।

শিবাজী উৎসবের সময়টি ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব। ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি একটি সরকারী নথি পাওয়া গেছে। সেখানে বলা আছে ঃ 'চন্দ্ধন্ত্রপ্ত ন্তুনন্ধন্দ্বস্ত্র ম্মন্সভ্রন্দ্বন্ত্ত, চন্দ্ধ-ন্ত্রপ্ত স্তুন্ননস্তুন্দ্বস্ত ভ্রনপ্তপ্ত ম্মন্তপ্তপ্ত ব্দন্দ্বন্দ্বন্তপ্ত স্তুনন্দ্রন্দ্রন্দ্বন্তজন্দ্ধন্ধ ভ্রন্তন্দ.' লর্ড কার্জন ভাবতেন বাঙালী নিজেদের জাতি হিসাবে ভাবতে শুরু করেছে। এই ভাবনার অঙ্কুরটি টিপে মেরে ফেলা দরকার। কারণ তা থেকে ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষ অনিবার্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ ব্যবচ্ছেদকে 'স্তুপ্সন্তুন্দ্বন্নন্দ্বন্দ্ব ন ব্দন্দ্বন্তুন্তজন্দ্বন্ধ ম্মন্স্ত্র' বলেছিলেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-এ লর্ড কার্জনের একটি চিঠিতে বিষয়টি স্পষ্ট।

দেশ ও জাতিকে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের কিছু 'মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালী সন্তান'-কে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের লক্ষ্য করলেও ১৩১১ নাগাদ তাঁর চোখে জাতীয়তাবাদ একটি সদর্থক চেতনা হয়ে ধরা পড়েছে। তিনি দেখেছেন ভারতকে—তাঁর ধ্যানের ভারত অতীতের গৌরব থেকে প্রতীকের চমৎকারে, প্রতীকের ভূগোল থেকে বর্তমানের ত্যাগ ও উদ্দীপনায় আর সেখান থেকে বিশ্বব্যবস্থায় নতুন এক চৈতন্য ও ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠায় গতিশীল হয়েছে।

'গীতাঞ্জলি'-পর্বে কিছু সনেট ও গানে বিষয়টি পরীক্ষিত হতে পারে। যে ভারত নৃপতিকে 'মুকুট দণ্ড সিংহাসন' ত্যাগ করতে শিখিয়েছে, 'ধর্মযুদ্ধে' অবতীর্ণ করেছে; কর্মীকে শিখিয়েছে 'যোগ যুক্ত চিতে সর্বফল স্পৃহা ব্রহ্মে' সমর্পণ করার তত্ত্ব; গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম ও অতিথি বৎসল হতে—'প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে' কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি দিতে—সেই ভারতকে পেতে চান তিনি। যা ভোগকে সংযত করে—'নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য'-কে করে দীপ্তিমান ('উজ্জ্বল') । পরাধীন ভারতবর্ষের প্রধান ত্রুটি 'অন্তরের সে সম্পদ' হারিয়ে ফেলা। ব্রাহ্মণের 'ধ্যানবল' 'জপমাত্র' সম্বল হয়েছে, 'শুচিত্ব' নেই—আছে 'অর্থহীন অভ্যস্ত আচার'। এই অবস্থায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ভিক্ষাবৃত্তির মতো। সেই আড়ম্বর আসলে দেশকে না চেনার গ্লানি, পরাজয়ের পূর্ব লক্ষণ। 'পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র' লুঠবার চেষ্টা—অন্ধ অনুকরণশীল এই প্রবণতায় নেই ধ্যান, নেই সাধনা, নেই আত্মমর্যাদাবোধ। বিদেশীদের পক্ষে ভারতবর্ষকে চেনা অসম্ভব। তারা ভারতকে ভাবে দরিদ্র। ধনবাদ, সাম্রাজ্য গঠন, জাতিদ্বেষ, পরদেশ লুণ্ঠনে অভ্যস্ত তারা—'দরিদ্র রুধির পুষ্ট বিলাস'-এ প্রমত্ত তারা গড়ে তুলেছে বিশালাকার শিল্প কাঠামো। সেই 'অগণ্যচক্রে গর্জে মুখর ঘর্ঘর/ লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর, স্পর্ধার কাছে যারা নতজানু

হয়ে ভিক্ষা করছে—রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্য বরাদ্দ করতে চান ধিক্কার। এরা ভারতবর্ষের লজ্জা। দেশমাতৃকার কাছে 'শাক-অন্ন' আর 'মোটাবস্ত্র' পেলেই রবীন্দ্রনাথ খুশি;কারণ ভারতের ধন, সম্পদ, মেধা অন্যত্র—তাকে চিনে নিতে হয়।

ভারতবর্ষের যে ধ্যানমূর্তি রবীন্দ্র-কবিতায় উজ্জ্বল—তা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার সঙ্গে অনেকটাই মেলে। হিমালয় আর সমুদ্র—আসমুদ্র হিমাচল আমাদের দেশ। রবীন্দ্রনাথ তাকে খুঁজে পান তাঁর অন্তর্ভেদী কালাতীত কল্পনায়। দেশচেতনা কালচেতনায় এই দার্শনিক অভিসার নিষ্পন্ন হতে থাকে। 'অভ্রভেদী' হিমালয়ের সঙ্গীত আজ স্তব্ধ—'সামগীতহারা' সেই নৈঃশব্দ্য। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই আশা রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপ্ত রাখে। হিমালয়কে তাঁর মনে হয় মৌন পাঠক—'পাষাণের পত্রগুলি' 'থরে থরে' খুলে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করছে। হরপার্বতীর দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত, ধর্মসম্মত প্রেমময় সংসার যাত্রার কথা হিমালয়ের কন্দরে প্রস্তরে 'সহস্র খোলা পাতা'-য় লিখিত। এ হলো 'ভবভবানীর প্রেমগাথা'। বৈরাগ্য আর বন্ধনের সমাহার। এই জীবনবোধই তো বিশ্বকে ভারতবর্ষের দান—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা। আর 'সমুদ্র স্তমিত' যে ভারত—সেখানেও আছে প্রতীকের অনির্বচনীয় বৈভব। হিমাচল যদি ঊর্ধ্ববাহু ধ্যানমগ্ন ঋষি—সমুদ্র তাহলে 'অসীম জিজ্ঞাসারত' শিষ্যের মতো। 'ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের' এই মোহানায়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, নিক্ষিপ্ত হয়েছেন বন্দীশালায়—তাদের রুদ্র ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কবি তিনি, পর্যবেক্ষক—তবু, কখনো কখনো সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত হয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নরমেধ যজ্ঞ, হিজলী বন্দীশালার অত্যাচার সর্বত্রই এমন ঘটনার পরিচয় পাওয়া গেছে। আমরা দেখেছি এক অবিস্মরণীয় প্রাণ-তপস্বীকে। 'নমস্কার' বা 'সুপ্রভাত' এই পর্যায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। 'নমস্কার' শ্রী অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) -এর প্রতি শ্রদ্ধার অবসরে লেখা। ভারতের চরমপন্থী গণসংগ্রামের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন এখানে স্পষ্ট। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ঋষি অরবিন্দ—'সাবিত্রী'-র মহাকবি, পণ্ডিচেরির সংগঠক, অধ্যাত্মপথিক তখন অপেক্ষামান। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ তখন উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানেন এই সত্যমূর্তিকে বিদেশী শাসক শাস্তি দিতে পারবে না। 'বন্ধন শৃঙ্খল তার/চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—/কারাগার করে অভ্যর্থনা।'

বৃটিশ অত্যাচারে ক্লিষ্ট ভারতের মুক্তি-পাগল বীরদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন উদ্বেল তাঁর 'সুপ্রভাত' কবিতায়। এই কবিতা কত যে ফাঁসির আসামী বাঙালীকে সান্ত্বনা দিয়েছে! স্বাধীনতাকামী বীর সেনাদের জীবনাতীত এক দেশচেতনা হিসাবে এই মহৎ কবিতার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই, বিশ্বসাহিত্যেও আছে কিনা জানি না। কবিতাটিতে রুদ্রবেশে এক দেবতার অপার্থিব দ্যুতি আর উদাত্ত আহ্বান অনন্য ভঙ্গিতে ধরা পড়ে। আকাশে 'দগ্ধমেঘ' তার রন্ধ্রে দেবদীপ্ত মহাকালের অমোঘ আহ্বান ঃ 'যার যাহা আছে আনো বহি আনো/সব দিতে হবে চুকায়ে।' 'হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন' করে এই মরণজয়ী দেবতার ভাণ্ডটি পূর্ণ করতে হবে দেশবাসীকে। নান্যপন্থা। প্রাণতপস্যায় স্তব্ধ, প্রাণবেদনায় পূর্ণ অস্থির এক মহাভারত, দিগ্বিদিক চঞ্চ ল করে তুলেছে এই দৈববাণীতে। দূর হয়েছে ভয়তরাস, বেদনার পশ্চাদগতি, ভীরুতার অন্ধকার। কবি স্পষ্ট দেখছেন সেই আলোয় আলো এক ভারতবর্ষকে, তার চিত্রকল্প আমাদের দুর্গোৎসবের পটকে ছাড়িয়ে দেশ সারা দেশ হয়ে গেছে।

'তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে/দুখানা করিল কাটিয়া।'

এমনি এক আলোকিত প্রভাত—দেশব্যাপী গণচেতনার উদ্বোধন, সুপ্রভাত তো তাই। রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন মহাকালের বজ্রকণ্ঠ; দেশবাসীকে শুনিয়েছেন;

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

এক অর্থে এ কবিতা আধ্যাত্মিক;আর আধ্যাত্মিকতাকে পরিহার করে ভারতে জাতীয়তার সন্ধান অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ তেমনি ভেবেছেন।

পাশ্চাত্য নেশান—স্টেটের তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ মানেননি। তাঁর ভারতবর্ষ অতীত গৌরবকে লালন করে, সন্ধান করে—ভবিষ্যতের বহুজাতিত্বের অপূর্ব সমন্বয়কে সম্ভাবিত করে। 'গীতাঞ্জলি'-র 'মাতৃঅভিষেক' বা 'ভারততীর্থে' এই জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রশ্রয় আর আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে তার আশ্রয় দেখেছি। সবাই জানেন সেকথা—পুনরুল্লেখ করছি না।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ণ প্রয়াস

ডঃ অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বকবি কিংবা করিগুরু বলে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা যে উল্লাস বোধ করি, পল্লী উন্নয়ণে গঠন মূলক কর্মপন্থা নির্ণয়ে এবং হাতে কলমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করতে তিনিই পথ প্রদর্শক, এটা আমরা আজও মানতে পারিনি। ভারতে পল্লী উন্নয়ণ আন্দোলনে প্রথম স্থান দেওয়া হয় গান্ধীজীকে। তারপরে যোজনা কমিশনের প্রবর্তন এবং পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার স্রষ্টা হিসাবে নেহরুকে জায়গা দেওয়া হল। তৃতীয় স্থানে নাম করা হয় রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই নেহরু গ্রাম উন্নয়ণ কিংবা তার বাস্তবায়ন করতে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করেননি। স্বাধীন ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামের পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার গঠিত কমিটিই তার পরিকল্পনা রচনা করেছেন। মন্ত্রীসভার প্রধান হিসাবে তিনি কিছু গৌরব অবশ্যই দাবী করবেন। কিন্তু সংগঠক হিসাবে তাঁকে কোন স্থান অবশ্যই দেওয়া যায় না।

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থায় নিজস্ব ভূমিকা ছিল। একটি বিশেষ আদর্শ সামনে রেখে তিনি প্রধানত খাদিকেন্দ্রিক গ্রাম উন্নয়ণের পক্ষপাতী ছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি,

যন্ত্রের প্রাধান্য, পশ্চিমী অনুকরণ গান্ধীজীর কর্মপন্থাকে বিকশিত হতে দেয়নি। যদিও তিনি সহযোগী অনেক পেয়েছিলেন। গোটা কংগ্রেস সংগঠন গান্ধীজীর কর্মপন্থাকে মেনে নিয়েছে। নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর বাণীকে মন্ত্র বলেই মনে করেন। তবু খাদি চরকা ইত্যাদি পল্লী উন্নয়নের যা যা প্রক্রিয়া তিনি নির্দেশ করেছেন তার কোন অস্তিত্বই বেশিদিন থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠনের কথা বলতে গিয়ে অবশ্যই মনে রাখতে হবে হরিজন পত্রিকায় ১৯৪২ এর জুলাই মাসে বলেছেন—গ্রামীণ স্বরাজ বলতে বুঝি এক স্বরাট্ সাধারণতন্ত্র। এর আগে খাদি অহিংসা স্বাধীনতা অস্পৃশ্যতা শ্রম জমিদার প্রভৃতি নানা বিষয়ে নানা কথা বলেছেন। এগুলি ছিল তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংসা সংগ্রামের বিচার বিশ্লেষণ। সর্বাঙ্গীণ গ্রাম পরিকল্পনা তখন ছিল না।

নেহরু গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ এই তিন জনের গ্রাম পুনর্গঠন প্রয়াসের পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সময়ের দিক থেকে অবশ্যই পূর্ণতার দিক থেকেও তিনি ছিলেন সফল। এর প্রমাণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পুল্লী পুনর্গঠন সংবিধানের সূত্রগুলি দেখলেই অতি সহজে বোঝা যাবে। তিনি কেবল ভাবালুতার বশেই কিছু কবিতা প্রবন্ধ লিখে ক্ষান্ত হননি। তার আগে বলে নেওয়া ভাল যে আমাদের অদূরদর্শিতা এবং একদেশদর্শিতায় তাঁকে কেবল কবি হিসাবে সম্মান দিয়েছি। কিন্তু যখন তিনি কি রাজনীতি বা সমাজনীতি কিংবা পল্লী পুনর্গঠন বিষয়ে কিছু নূতন পন্থা দেখাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে বাস্তব বুদ্ধিশূন্য কবির স্বপ্ন ইত্যাদি বলতে দ্বিধা করিনি। তিনি আহত হয়েছেন। নিজের মনে বলেছেন—

দেবী অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া
ব্যর্থ সাধন খানি।

আমরা মনে করতে পারি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি কণ্ঠে নিয়ে তিনি কেমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই তিনিই কিন্তু অন্যান্য অনেক অযৌক্তিক প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এই পটভূমিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ণ কর্মধারা বিশ্লেষণ করতে পারি। ব্রাহ্মণের উদারতা, ধনাঢ্যের স্বচ্ছলতা, এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারের সুসংস্কৃত মন নিয়ে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে ১৮৮৯ সালে তিনি জমিদারির ভার নিয়ে পদ্মাতীরে এলেন। শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর বিরাহিম প্রভৃতি নামের অনেক গ্রামের মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলেন তিনি। তখনকার কালের প্রথম ব্যতিক্রমী জমিদার, তিনি মানুষকে প্রজা হিসাবে দেখলেন না। দেখলেন মানুষ হিসাবে। শোষণ নয় উন্নয়ণ চাইলেন তিনি আন্তরিক ভাবে। তিনি তখনকার এক চিঠিতে লিখছেন "প্রজাগুলোকে দেখলে বড় মায়া করে...এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো নিরুপায়। এই সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি চাষী জীবনের চিরস্থায়ী দারিদ্র্য দূর করতে পথ খুঁজতে থাকেন।

কবিতায় লেখেন—

শক্তি দম্ভ স্বার্থ লোভ মারীর মতন।
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন,
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শ বিষ তার।
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

সংঘবদ্ধতা ও এক সঙ্গে কোন কাজের এবং সুফল ভাগ করে নিতে পারলে সমাজে উন্নতি আসবে, এই নিশ্চিত ধারণায় তিনি গড়ে তুললেন কৃষি সমবায় ব্যাঙ্ক। যতদূর জানা যায় ভারতীয় সমবায় চিন্তার বাস্তব রূপ এই প্রথম দেখা গেল পতিসর নামের একটি অখ্যাত গ্রামে। তারও আগে অর্থাৎ জমিদারি ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সালিশি বিচারের প্রবর্তন করলেন। দশজনে বসে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে এসে ন্যায় অন্যায় নিরূপণ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া চালু করলেন। অযথা অর্থক্ষতির হাত থেকে বাঁচল মানুষ। সময়ও বাঁচল অনেক। অযথা দলাদলি বন্ধ হলো। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যা শিখতে আমেরিকা পাঠালেন। শিক্ষা শেষে বাবার সহযোগী হয়ে কাজ করেছেন তিনি। সৌভাগ্যক্রমে দু'একজন সমমনস্ক সঙ্গীও পেয়েছিলেন। তাঁর কর্মসূচীর বিবরণ দিতে গেলে সংক্ষেপে তা সম্ভব নয়। তবে অন্যভাবে এর ফলাফল বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন পরিণত বয়স্ক, তখন তিনি নিজের জমিদারিতে একবার গিয়েছিলেন। তখনকার বিবরণ তিনি নিজে দিয়েছেন। তার ছাড়া ছাড়া কিছু অংশ তুলে দিলে বোঝা যাবে পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ কি করেছিলেন।

তিনি বলছেন

"সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল, পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র আর ধরছে না।...পাঠশালা মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে...তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির কাজ ভাল চলছে। মামলা মোকদ্দমা খুবই কম। জেলেরা নানা ধরনের মাছ ধরার সামগ্রী উপহার দিলে কামারেরা তাদের তৈরি নানা ধরনের জিনিষপত্র দিয়ে গেল। যে তাঁতি আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি শাড়ি বুনছে।" মোট কথা গ্রামের যে আর্থিক দুরবস্থা ছিল তা আর নাই।

গ্রাম বা সমাজ উন্নয়ণে শিক্ষার যে একটা বিশেষ স্থান আছে তা সকলেই স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে আত্মশক্তি বিকাশের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষাকে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে একমত ছিলেন না। তার জন্যও তাঁকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে

হয়। এর ফলে তিনি ১৯০১ সালে মাত্র পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে গড়লেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়িত হলো বিশ্বভারতীয় অভ্যুদয়ে। তার মূল কথা ছিল "যত্র বিশ্বভবত্যেক নীড়ম্"। গান্ধীজীর গ্রাম পরিকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ ফুটে উঠেছে এই কথা
কয়টিতে।

এর অনেক দিন পরে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল দেশের মানুষকে হাতে কলমে কাজের দ্বারা বৃহত্তর সমাজের সকলের সঙ্গে যুক্ত করা। সৃষ্টি হলো শিল্পভবন, স্বাস্থ্য সমবায়, আসবাবপত্র তৈরির ও শিক্ষণের কেন্দ্র, কৃষিবিদ্যা শিক্ষণ কেন্দ্র। বহু গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল এই কর্মধারা। মানুষ শিখল স্বয়ম্ভর হতে।

গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মানুষের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বিদ্যুতের সহায়তা প্রভৃতিকে অস্পৃশ্য রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তারই সহায়তায় উৎপাদন এবং তার বিপণন ব্যবস্থা করেছিলেন। যার ফলে এর সংস্পর্শে আসা মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি ঘটেছে।

পল্লী উন্নয়ণের আর একটি দিক মেলার প্রবর্তন। মেলা যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন ঘটায়, তেমনি গ্রামে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থাও সহজভাবে হয়। তাই প্রধান পৌষ মেলার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট মেলা এবং হাটের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ণের ব্যতিক্রমী প্রকাশ তার 'লোকশিক্ষা সংসদ' প্রতিষ্ঠায়। এই সংসদের উদ্দেশ্য হলো গ্রামে যারা পড়তে চায় অথচ সময় এবং অর্থাভাব কিংবা অন্য কারণে পড়তে পারে না তাদের নূতন রীতির মাধ্যমে পড়ানো এবং পরীক্ষা নেওয়া প্রশংসাপত্র দেওয়া ইত্যাদি। এতে জিজ্ঞাসু গ্রামের মানুষ জানার পথ পেয়ে তৃপ্ত হোত।

পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন সরকারের সমষ্টি উন্নয়ণ প্রকল্পের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। তেমনি বিশ্বভারতী সরকারি শিক্ষা কাঠামোর সঙ্গে মিশে তার মূল উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়েছে। মনে রাখতে হবে তখন রবীন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নাই। তাই বলে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ণের স্বাতন্ত্র্য এবং সঠিক ভাবনাকে লঘু করে দেখার কোনও কারণ নাই।

তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে

নবকুমার ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার গীতিকারদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। পারিবারিক প্রয়োজনে, ব্রাহ্মসমাজের জন্যে এবং শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ঋতু উৎসবে বিদায় সম্বর্দ্ধনা, অভ্যর্থনা, স্বদেশবন্দনা, মন্দিরের উপাসনার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল সংখ্যক আনুষ্ঠানিক গান রেখে গেছেন, রেখে গেছেন এমন সকল গান যে সকল গানে মানুষ একান্ত ভাবে আপনাকে পায়। ব্যক্তি মানুষ যেমন নিজেকে পায়, তেমনি সামাজিক মানুষ তার সমাজকে পায়। প্রতিটি মুহূর্তের গানের জন্যে একমাত্র তিনিই বাঙালির গানের সম্ভার রেখে গেছেন, যাঁর দ্বারস্থ বাঙালিকে হতেই হবে। বাঙালিকে তার আনন্দে, শোকে, উৎসবে, সজনে-বিজনে, যুদ্ধে-দেশবন্দনায় তাঁর গান গাইতেই হবে। চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্য, জয়দেব এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বরাট। এঁদের কারও সঙ্গে কারও তুলনা চলে না এজন্যে যে, এঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সবকিছু মেনেও বলতে হয় রবীন্দ্রনাথই এঁদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'নির্জন এককের গান রবীন্দ্র-সঙ্গীত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বাংলা গানের ভাব ভাষা ও বিন্যাস প্রায় এককভাবে গঠন করতে হয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ গানের একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছিলেন। সেই জগৎ বৈদিক, লৌকিক ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে গড়ে উঠেছিল। তিনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে—এই তিন প্রভাব মিলিয়ে, সমন্বয় করে সম্পূর্ণ নতুন আর একটি নতুন ধারার সৃষ্টি। গানের এই নবতম ধারাটিই হলো রবীন্দ্রনাথের গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ

করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গভীর অন্তঃস্বভাবে কোথায় যেন এই ত্রিবেণীসঙ্গমের জনকল্লোল স্মৃতির মতো সংসক্ত হয়ে রয়েছে। সত্যি বলতে কি রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলা গানের নতুন আলাদা জগৎ আর কেউ তৈরি করতে পারেনি। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বলতেন শেষ পর্যন্ত তাঁহার গানগুলিই টিকিবে।'

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত জনতার দরবারে একটা আলাদা মাত্রা পায়। ১৮৮৬ ও ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আগত প্রতিনিধিমণ্ডলীর অনেকেরই রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। যদিও তখন বেশির ভাগ বাঙালি রবিঠাকুরের নামের সঙ্গেই পরিচিতি ছিলেন না। সেটা ঘটেছিল ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানের ডালি নিয়ে পথে নামলেন। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিলেন তিনি। তাঁর গান এবং কণ্ঠও এই আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠল। ওইদিন কবি 'রাখীবন্ধন'-এর দিন হিসেবে পালনের আহ্বান জানালেন এবং বিশাল শোভাযাত্রার সামনে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গান করতে করতে গঙ্গাতীরে গেলেন। সেই সকালের স্মৃতি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়, 'রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে। মহাধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল'। ঐদিন বিকালেই উত্তরকলকাতার রাস্তা পরিক্রমাকালে কবি গাইলেন, 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'। ওই সময়েরই আর একটি গান 'আমার সেনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'ওই সময় আমার সোনার বাংলা' গানটি সর্বত্র গাওয়া হতো'। বঙ্গভঙ্গের হাত ধরেই রবীন্দ্রনাথ মিশে গেছিলেন জনতার দরবারে। এরপর থেকেই তাঁর লেখনীতে পুষ্ট হয়েছে স্বদেশ সংগীত ও ভারতবন্দনা। 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' বা 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'য় বাঙালি অভিভূত হয়েছিল। তবুও চিত্তরঞ্জন দাশের মতো কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে 'স্যার রবীন্দ্রনাথ' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় এই বিদ্রূপের দুবছর পরে যখন পাঞ্জাবে বৃটিশ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'নাইট' খেতাব বর্জন করেছেন, তখন চিত্তরঞ্জনের অন্যতম অনুরাগী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র অমল হোমকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন। "...রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন তখন নাকি দাশসাহেব কেঁদেছিলেন, এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন' (১৬।৮।১৯১৯)।

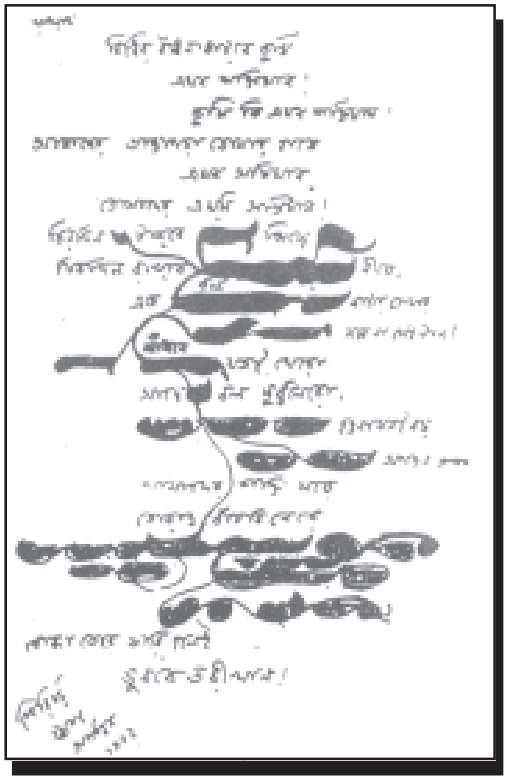

রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি— নিজেরই লেখা একটি গান।

রবীন্দ্রনাথের ওই সাহসিক খেতাব বর্জনকে অভিনন্দন জানাবার ঔদার্য বা সৎসাহস সে সময় স্বদেশের রাজনীতির কর্ণধারদের কেউ দেখাতে পারেননি—গান্ধী, চিত্তরঞ্জন কেউ না। অমৃতসর কংগ্রেসে খেতাব বর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনের প্রস্তাব তোলানোর চেষ্টা অমল হোম করলেও চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বাঙলার নেতারা তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে যান। মোতিলাল নেহেরু প্রথমে রাজি হয়েও পরে চেপে যান (পুরুষোত্তম রবীন্দ্রথাম ঃ অমল হোম)। পরবর্তীকালে হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমি যখন স্বদেশী সমাজ লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কংগ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন।...কিন্তু আমার সেদিনকার কথার টুকরো নিয়ে পরবর্তী অনেক দেশাত্মবাদী তাঁদের বাণীরূপে ব্যবহার করেছেন এবং দেশে ধন্য হয়েছেন" (৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৯)।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই হেমেন্দ্রমোহন বসু প্রথম ১৯০৫-০৬ সালে কবিকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'সোনার তরী' গান দুখানি ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে রেকর্ড করান। পরে গ্রামোফোন কোম্পানি এই দুটি গানই ডিস্ক রেকর্ডে স্থানান্তরিত করেন ১৯০৮-০৯ সালে। এরপর কবি আরো কিছু স্বদেশীগান রেকর্ড করেন। বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠেও রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড হয়।

তখনকার শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বলাইদাস শীল, পূর্ণকুমারী ও মনসাসুন্দরী দাসী। এই ডিস্ক রেকর্ডও রবীন্দ্রনাথের গানকে জনতার হাতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে'—দিকে দিকে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আরও পরে 'জনগণমন' ভারত চিন্তার প্রেরণা স্বরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুমি কেমন করে

অর্ণব নাগ

ক্রিং ক্রিং।

হ্যালো সুমিত্রা সেন আছেন।

বলছি।

নমস্কার, স্বস্তিকা থেকে বলছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-সার্ধশতবর্ষে আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব। একটু সময় দেবেন?

আমায় আবার কেন? আরও তো অনেকে রয়েছেন!

সে কি? রবিঠাকুরকে সেলুলয়েডে বন্দী করেছেন আপনি! জেলারের মতামতটা লোকে শুনতে চাইবে না?

ওরে বাবা! চলে এস তাহলে।

কয়েকদিন পর...

সুমিত্রা সেনের বাড়িতে...তাঁরই ড্রয়িংরুমে বসে...

ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-সার্ধশতবর্ষে একজন অসামান্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রথমেই আপনার প্রতিক্রিয়াটা জানতে চাইব।

ও আমি মনে করি, সবার উর্দ্ধেই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জন্মদিন যে কবে একশ' থেকে পেরিয়ে দেড়শ' হয়ে গেল তা আমাদের মনেই আসেনি। কারণ সবসময় তিনি তাঁর গান নিয়ে, রচনা নিয়ে, কাব্য নিয়ে আমাদের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছেন। সেজন্যই বিশেষ কিছু মনে হচ্ছে না। যেমন দেখ, কালের নিয়মে আমাদের সকলেরই কিন্তু বয়স বেড়ে চলেছে। কিন্তু এটা যেন আমরা ভাবতেই পারি না, মানে ভাবি-ই না। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছে। এত বছর পেরিয়ে এসেও মানুষ যেভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করছে, ভালবাসছে, মনে রাখছে;তাঁর স্মরণে কত অনুষ্ঠান হচ্ছে, এগুলো সত্যিই ভাববার বিষয়। তবে আমার মনে হয় না যে খুব বেশি লোকের এরকম হচ্ছে, বা হয়ইনি হয়তো!

ও আপনি যে সময় গাইতে শুরু করেছিলেন তখন যে সাংগীতিক পরিবেশটা ছিল, কালের নিয়মে তার অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনটুকু বাদ দিলে, তার খুব বড় ধরনের কোনও পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করতে চাইবেন?

ও একটা জিনিস লক্ষ্য করো। আমরা যখন গাইতে শুরু করেছিলাম, তখন স্রেফ রবীন্দ্রনাথের গান ছিল আর সমকালীন কবিদের হয়তো কয়েকটা গান ছিল। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনেক বেশি কাছে পেয়েছিলাম। আর সেইসময় শ্রোতা যাঁরা থাকতেন, তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেই ভালবাসতেন, সেই কারণেই তাঁরা আসতেন। এখন হয়েছে কি, ওই যুগের পরিবর্তনের যে কথাটা বললে তা আসতে বাধ্য। ফলে নানা ধরনের গান এসেছে। নানা কবিদের গান। যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা বহু কবিতা, সলিল চৌধুরীর সুরে গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এখন এসেছে বাংলা ব্যান্ড, তারাও চুটিয়ে রাজত্ব করছে। এগুলো ভাল না মন্দ, আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। তবে এর মধ্যে সবই যে মন্দ এমন নয়, শিক্ষামূলক কিছু জিনিস এর ভেতরেও রয়েছে। যাই হোক, সেই কারণে অনেক কিছুর মধ্যে এখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে খোঁজার চেষ্টা করছি। ফলে তখনকার আর এখনকার সাংগীতিক পরিবেশের একটু হেরফের তো হবেই।

ও তা ঠিক। কিন্তু সেই সময়ের রবীন্দ্র-গানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তাতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে শুধুমাত্র তবলা, মন্দিরা এবং এসরাজের ব্যবহার থাকত। হাল-ফিলে দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের গানে গীটার বাজছে। বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটাকে কি চোখে দেখছেন?

ও ঠিকই। আমাদের সময়ে জলসা বা অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে যা থাকত, তা হলো তবলা, খোল, একটা পার্কারসান আর খুব বড়জোর একটা ভায়োলিন। আর রেকর্ডিং-এর সময়ে থাকত এসরাজ, সেতার ও বাঁশী। এর পরবর্তীকালে এল গীটার। তারও পরে এল সিন্থেসাইজার। এখন তো স্যাক্সোফোন ইত্যাদি ওয়েস্টার্ন মিউজিকের অনেক কিছু এসে গেছে। এগুলো খারাপ কিছু নয়।

ও এটা কেন এল? রবীন্দ্রনাথের গানে পাশ্চাত্যসঙ্গীতের একটা প্রভাব ছিল বলে? কিন্তু তিনি তো পাশ্চাত্যের সুর-কে ভারতীয় বাজনায় ধরতে চেয়েছিলেন।

ও হ্যাঁ, তাঁর গানে পাশ্চাত্যসঙ্গীতের একটা প্রভাব তো আছেই। ধরো, রবীন্দ্রনাথের যে গান পাশ্চাত্য-প্রভাবিত তাতে যদি স্যাক্সোফোন বা সিন্থেসাইজার এগুলো বাজে তাতে দোষের কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন যে তাঁর গানে এ সবই থাকবে, তবে স্তিমিতভাবে। সেই গানকে ওভারল্যাপ করে নয়। তাঁর গানকে সামনে রেখে পেছনে একটা হাল্কা সাপোর্টার হিসেবে স্যাক্সোফোনের মতো বাদ্যযন্ত্র থাকলে গানটা শুনতে ভাল লাগবে। মোদ্দা কথা হলো, গানটা তোমার ভাল লাগছে কিনা। গানের সুর কিংবা কথাকে ডিস্টার্ব না করে আর জগঝম্প বাজনা না বাজালেই হলো।

ও রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এর কথা। যে কথা-কে বাঙালীর সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক বলেই ধরা হয়। পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট সুরলহরী কি কিছুটা হলেও ব্যাহত হবে না? সেক্ষেত্রে তাঁর গানের কথার মাধুর্যটাই তো নষ্ট হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

ও না, তা নয়। সুরটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে খুব হাল্কাভাবে তোমায় মিউজিকটা ইউজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে মূল রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনও হেরফের হবে না।

ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকে চলচ্চিত্রায়িত করার ব্যাপারে আপনার অবদান অনস্বীকার্য। প্রথম কোন ছবিতে গেয়েছিলেন?

ও প্রথম গেয়েছিলাম 'শুন বরনারী' ছায়াছবিতে। সে অনেকদিন আগের কথা। উত্তমকুমার আমায় ওই ছবিতে গাইতে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন। সেই গল্পটা বোধহয় জান তোমরা!

ও এটুকু জানি যে তিনি আপনাকে দিদিভাই বলে ডাকতেন। এবং উত্তমকুমারের সঙ্গে আপনার একটা খুব মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁর অজস্র ছবিতে আপনি গেয়েছেন। এই মুহূর্তে একটা অনন্যসাধারণ ছবির কথা মনে পড়ছে। শরৎচন্দ্রের লেখা গৃহদাহ ছবিতে আপনি সুচিত্রা সেনের লিপে 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার' গানটা অসাধারণভাবে গেয়েছিলেন।

ও (হাসি) হ্যাঁ;'শুন বরনারী' ছবিতে গান করবার জন্য উত্তমকুমার যখন আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। শুধু উত্তমকুমার কেন! কোনও কুমারকেই তখন ভালভাবে চিনতাম না। আমি তখন সবেমাত্র গাইতে শুরু করেছি। সিনেমা আর্টিস্ট দের প্রতি অতিরিক্ত কৌতূহল আমার মোটেই কোনওকালে ছিল না। উনি আমাকে একদিন ফোন করে বললেন, দিদিভাই আমি অরুণকুমার বলছি গো! তখন তাঁর নাম ছিল অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে চিনতে না পারলেও সেই ভয়েসটা এতই সুন্দর ছিল যে তা আজও আমার মনে গেঁথে রয়েছে। তার ওপরে চাক্ষুষ পরিচয় না হয়েই এই দিদিভাই ডাকটা আমায় মোহিত করে দিল। তারপর তিনি বললেন, 'আমার বই-তে একটা গান আছে। সেটা তোমায় গাইতে হবে। একদিন তোমার বাড়ি যাব।' তিনি এলেন আমার বাদুড়বাগানের বাড়িতে। জান, এটা আমার সত্যিই অদ্ভুত লাগে। আমার মতো তখন আরও অনেক শিল্পী ছিলেন। আমাকে স্পটে আনার কোনও যুক্তিই আমি খুঁজে পাই না। কিন্তু উত্তমকুমারের এই পুরো ব্যাপারটা আমায় এতটাই ইম্প্রেসড করল যে এটাই আমার সঙ্গীতজীবনের মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিল। ওনার (উত্তমকুমারের) ডাকে আমি সাড়া না দিয়ে

পারলাম না। তারপর কত ছায়াছবিতে গেয়েছি। যাই হোক, উত্তমকুমারের আহ্বানে 'শুন বরনারী'-তে গাইলাম—'ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে'। আমার সেই প্রথম প্লে-ব্যাকে লিপ দিয়েছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। আজ ভাবলে অবাক লাগে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান প্লে-ব্যাক করেছি।

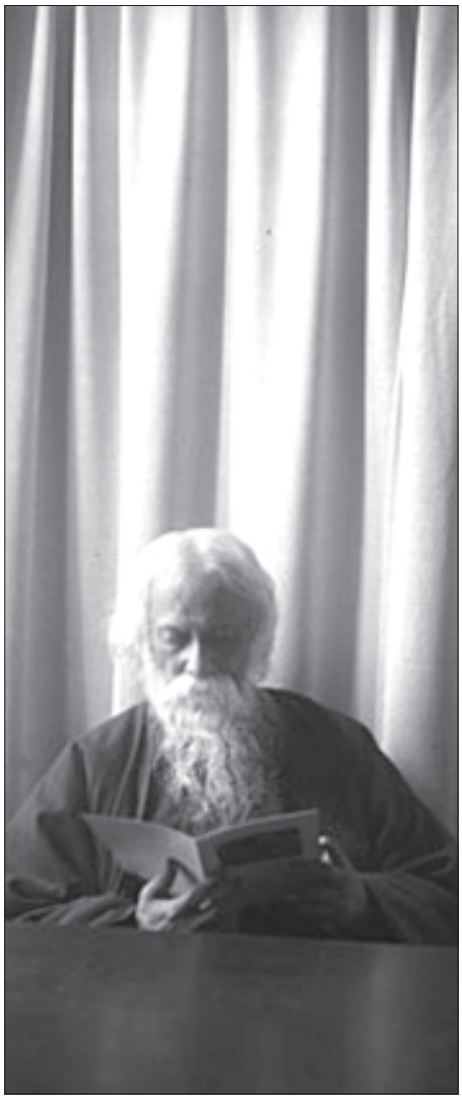

শু রবিঠাকুরকে সেলুলয়েডে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আসবে আপনার আর চিত্র-পরিচালক তরুণ মজুমদারের নাম। তরুণবাবু পরিচালিত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবি 'সখী ভাবনা কাহারে বলে' গানটার ক্ষেত্রে আপনার প্লে-ব্যাক করা নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিষয়টাই একটু জানতে চাইব।

গু ওই ছবিতে হয়েছিল কি, তরুণ মজুমদার গান গাওয়ার ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, বোধহয় গান গেয়েওছিলাম। আসলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাটা হলো, 'জোর যার মুলুক তার' গোছের। মানে যার হাতে পয়সা, তার হাতেই সবকিছু। ওই ছবির প্রযোজক ছিলেন একজন অবাঙালী। তিনি হঠাৎ বলে বসলেন যে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গান গাওয়াতে হবে। লতা মঙ্গেশকরকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি, তাঁর মতো শিল্পী আর হয় না। তবে এখানে একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে সুরটা না হয় ঠিকভাবে করা হলো কিন্তু সেই গানের কথার উচ্চারণ সঠিকভাবে করা, বাংলাভাষার প্রতি গভীর অধ্যয়ন না থাকলে তা সম্ভব নয়। তো যাই হোক, ওই বছরই এইচ এম ভি থেকে আমি 'সখী ভাবনা কাহারে বলে' গানটা রেকর্ড করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে যা প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। আজও আমি যখন কোনও অনুষ্ঠানে যাই, এমনকী ইন্দ্রাণী-শ্রাবণীরাও (সুমিত্রা সেনের বড় ও ছোট কন্যা) যখন কোথাও গাইতে যায়, লোকে এই গানটাই বারবার শুনতে চায়। তবে লতা মঙ্গেশকর অবশ্যই একজন কিংবদন্তী শিল্পী। কিন্তু এক্ষেত্রে বলব আমার 'শাপে বর হয়ে' গেছিল।

শু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যখন চলচ্চিত্রায়িত করছেন তখন নায়িকার গলায় সেটা 'ম্যাচ' করানোর জন্য আদ্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কি কোনও পরিবর্তনের দরকার হচ্ছে?

গু অবশ্যই। চলচ্চিত্রায়িত করা মানে তো অভিনয় করা। তোমাকে গানের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করে বোঝাতে হবে এই তার মানে, এই তার সিচ্যুয়েশন। সেই কারণে এখানে নায়িকার অ্যাপিয়ারেন্স, কিভাবে তিনি লিপ মেলাবেন সবকিছুই কিন্তু শেখার। গায়িকাদেরও সবকিছু শিখতে হয়। যেমন আমাকে শিখতে হয়েছিল গানের এক্সপ্রেশানের ব্যাপারটা। কোন পরিস্থিতির মধ্যে গাইতে যাচ্ছ, সেটা তোমাকে আগে বুঝে নিতে হবে। যেমন গানের এক্সপ্রেশানটা দুঃখের না আনন্দের তা বুঝে নিয়ে গায়িকাকে গাওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে। এমনিতে, রবীন্দ্রনাথের যে কোনও গানে এক্সপ্রেশানটা সবচেয়ে দরকারি। আমি অন্তত তাই মনে করি। দেখ, 'সখী ভাবনা কাহারে বলে' এই গানটা আমি এমনভাবে গেয়েছিলাম যে গায়কীটা লোকের ভালো লেগেছিল। আসলে এই 'গায়কী'-টাই কিন্তু গানের প্রাণ।

শু সুচিত্রা সেনের লিপে আপনার বেশ কয়েকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত রয়েছে। পর্দার বাইরে তাঁর সাথে আলাদা করে কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

গু শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতই নয়। সুচিত্রা সেন অভিনীত 'কমললতা' ছবিতে রবীন চ্যাটার্জীর সুরে ওর লিপে আমি গেয়েছিলাম 'তুলসী তুলসী বৃন্দাবন' গানখানি। আমার বিয়ের আগে আমি থাকতাম বালিগঞ্জ প্লেসের কাছে। সেখানে এখনও আমাদের বাড়ি আছে। সুচিত্রা সেনের শ্বশুর হলেন আদিনাথ সেন। খুব বড় 'শিক্ষাবিদ' ছিলেন তিনি। তাঁর স্বামী হলেন দিবাকর সেন। খুব পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন ওনারা। যাই হোক, আমরা পড়তাম বেঙ্গল মিউজিক কলেজে। আমার বাড়ি থেকে সুচিত্রার বাড়ি খুব একটা দূরে ছিল না। মিউজিক কলেজে যাবার পথে দু'জনের প্রায়শই দেখা হোত। তো সেখানে যেতে আসতে দু'জনের আলাপ হলো। তিনিও গান শিখতেন ওই কলেজে। গান শিখে দু'জনে একইসঙ্গে গড়িয়াহাট থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। সেই থেকে আমাদের পরিচয়। তখন উনি সেরকম বিখ্যাত কিছু হননি।

শু আর দু'জনেই যখন সুবিখ্যাত হলেন, তখন সেই পরিচয়ের মাত্রা কি আরেকটু বেড়েছিল?

গু বিখ্যাত হওয়ার পর একটা কুণ্ঠাবোধ এল—যদি আমাকে না চিনতে পারে সুচিত্রা! এটা আমি সহ্য করতে পারব না। তখন ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'কোমল গান্ধার'-এ প্লে-ব্যাক করছিলাম আমি। একদিন স্টুডিও-তে গানের রেকর্ডিং-এ জর্জদা, আমার স্বামী— তিনি এখন আর নেই, আমি—সবাই মিলে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। তো আমি রিহার্সালের একফাঁকে একটু বাইরে বেরোলাম। তখন ওখানেই 'স্মৃতিটুকু থাক' বলে একটা ছায়াছবির শুটিং চলছিল। তাতে সুচিত্রা সেনের ডবল রোল ছিল। আচমকাই চোখে পড়ল সুচিত্রা একটা ফ্লোর থেকে আরেকটা ফ্লোরে ক্রস করছে। আমাকে দেখেই ও বলল 'আরে সুমিত্রা না!' আমি কাছে যেতেই

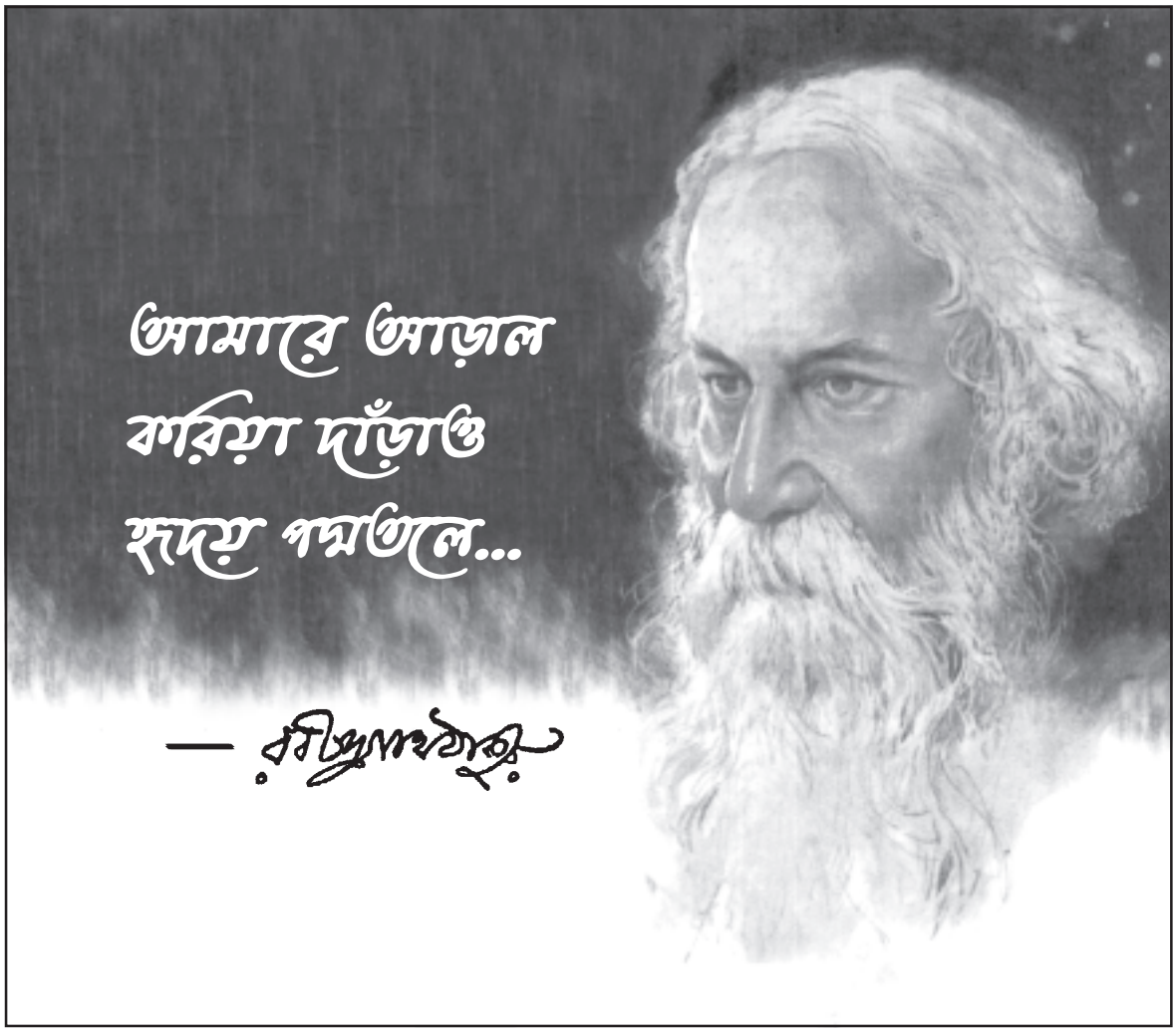
আমারে আড়াল
করিয়া দাঁড়াও
হৃদয় পদ্মতলে...
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জড়িয়ে ধরল। এরপর আন্তরিকভাবে বলতে লাগল, 'তোমার তো বিয়ে হয়ে গেছে। আগের চাইতে একটু মোটাও হয়েছে।' ও এসব বলে চলেছে আর আমি খালি ভাবছি—'কতক্ষণে সবাইকে গিয়ে এই খবরটা জানাব!' কারণ সুচিত্রা সেন তখন খ্যাতির তুঙ্গে, সে কিনা আমার সঙ্গে এত আন্তরিকভাবে কথা বলছে! সেইসঙ্গে মনে মনে এটাও ভাবছি—'এমন ভদ্র একটা মেয়ের সম্বন্ধে আমি কি ধারণাটাই না পোষণ করতাম।' কথা শেষ হতেই ছুটে গেলাম আমাদের আড্ডায়। জর্জদাকে (দেবব্রত বিশ্বাস) বললাম, জানেন কার সাথে দেখা হলো? জর্জদা বললেন, 'কার সনে?' উনি বাঙাল ভাষায় খুব কথা বলতেন। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে শুনে ওই ভাষাতেই তিনি বললেন—'আমারে কইলেন না ক্যান? আমি একটু দেখতাম। এটা অন্যায় করসেন।' এখন তো তিনি (সুচিত্রা সেন) কাছেই থাকেন। শুনেছি, একজনকে বলেছেনও যে, সুমিত্রাকে একবার দেখা করতে বল। আসলে আমি তো 'ইন্টিমেসি' রাখার চেষ্টা করিনি, তাহলে হয়তো খুবই থাকত।

শু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা সে যুগে যতটা ছিল, এ যুগেও কি ঠিক ততটাই আছে? আপনি কি মনে করছেন?

গু আমার তো মনে হয়, সেই প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। কারণ তাঁর যে কোনও ধরনের গান নিয়ে এত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, প্রাসঙ্গিকতা হারালে তা সম্ভব হোত না। এত হানাহানি, এত দুঃখ-কষ্টের মাঝে তাঁর গান আজও আমাদের হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, আজকের দিনেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

শু চিত্রনাট্যের খাতিরে বিভিন্ন পরিচালক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের গানকে তাঁদের পরিচালিত চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন। যেমন সত্যজিত রায় 'চারুলতা' কিংবা 'ঘরে-বাইরে'-তে একভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রয়োগ করেছেন, ঋত্বিক ঘটক 'কোমল গান্ধার' বা 'যুক্তি-তর্ক-গল্প'-তে আরেকভাবে প্রয়োগ করেছেন, আবার তরুণ মজুমদার 'দাদার কীর্তি' থেকে শুরু করে 'আলো' পর্যন্ত অসংখ্য ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গানকে অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করেছেন। আপনার নিজের গাওয়া কোনও গানের ক্ষেত্রে এরকম কখনও মনে হয়েছে যে চলচ্চিত্রের ওই সিকোয়েন্সটার জন্যই বোধহয় রবিঠাকুর এই গানটা রচনা করেছিলেন?

গু (একটু ভেবে) ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবির কথা বলব। সেখানে নীতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। তাতে আমি গেয়েছিলাম—'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'। ছবির সিকোয়েন্স অনুযায়ী কেন জানি না গানটাকে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল।

শু আপনি তো এখনও গান শেখান। সেসময়ের আর এসময়ের শিক্ষার্থীদের মানসিকতার কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?

গু শোন, এখন লোকে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সংসারের প্রতি পদে ঠোক্কর খেতে খেতে তাদের এগোতে হচ্ছে। মনের স্থিরতাটা খুব কমে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান হলো শান্ত মনের গান। বুঝতেই পারছ, সেই শান্ত মনে গাওয়ার সুযোগ এখন আর নেই। আমরা তো শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়েই থাকতাম। কিন্তু এখনকার শিক্ষার্থীরা আরও অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত। জীবনটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়েছে বলেই মানসিকতার একটু হেরফের তো হবেই।

শু আপনি কার কাছ থেকে তালিম নিয়েছিলেন?

গু আমার মা 'অমিয়া দাশগুপ্তর' কাছে আমার গানের হাতেখড়ি হয়েছিল। তারপর ওই যে বললাম বেঙ্গল মিউজিক কলেজে শিখেছি। ক্লাসিক্যাল শিখেছিননীগোপাল ব্যানার্জীর কাছ থেকে। আমি শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতই নয়, তখন যেহেতু টিভি আসেনি তাই রেডিওতেই সবধরনের গান করেছি। আধুনিক, গীত-গজল-ভজন, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, বাউল এমনকী কীর্তন পর্যন্ত গেয়েছি। রেডিও আর্টিস্ট হিসেবেই তখন পরিচিতি ছিল আমাদের। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছেও কিছুদিন গান শিখেছি।

শু টেলিভিশনে প্রথম কবে গেয়েছিলেন?

গু ১৯৭৪-এ বাংলাদেশের ঢাকায় গিয়ে প্রথম টিভি-তে গাই। এর পরের বছরই যখন দূরদর্শনের সূচনা হলো কলকাতায় তার প্রথমদিনই আমি আর সাগর (সেন) 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটা গেয়েছিলাম টিভি-তে।

শু তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মাতৃতন্ত্রের একটা ধারা আপনার পরিবারে চলে আসছে। প্রথমে অমিয়া দাশগুপ্ত, এরপর আপনি, তারপর ইন্দ্রাণী সেন ও শ্রাবণী সেন, এরপর কি রুক্মিণী সেন (ইন্দ্রাণী-র কন্যা)?

গু (হাসি) রুক্মিণী ভাল গাইতে পারে। কিন্তু ও তো গানের জগতে এল না!

শু অবনঠাকুর বর্ণনা দিয়েছেন—সারা কলকাতা যখন দুর্গোৎসবে মাতোয়ারা, তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একতলা থেকে তিনতলা সাজছে মাঘোৎসবের জন্য। এই মাঘোৎসব-কে জড়িয়ে আপনার কোনও বিশেষ স্মৃতি?

গু মাঘোৎসবে আমি যে নিজে গেয়েছি! আমি বৈতালিকেও কিছুকাল গান শিখেছিলাম। এর কর্ণধার ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ গান করতেন, অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ ছিলেন তিনি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই 'মহাপুরুষ'কে দেখার। আমি রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখিনি। কিন্তু আমার কেবলই মনে হোত, রবীন্দ্রনাথের পাশে কারুকে বসাতে চাইলে একমাত্র এঁকেই বোধহয় বসাতে পারব। প্রতিবছর মাঘোৎসবের (১১ মাঘ) ঠিক একমাস আগে থেকে আমাদের রিহার্সাল শুরু হোত। মনে আছে, প্রথম বছর আমি গেয়েছিলাম 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা। আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি, সকলই হয়েছে বোঝা।' মনে পড়ে জোড়াসাঁকোর

ঠাকুরদালানে একদিকে আমরা বসে থাকতাম, অন্যদিকে বসে উনি (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) শুনতেন গানটা ঠিক হচ্ছে কি না। আমি ওনাকে এতই ভয় পেতাম যে ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলতে পারতাম না। ওনার মা আমাদের বলতেন সেজে আসতে, চুলে ফুল লাগাতে। আর এই উৎসবের শ্রোতা কারা ছিলেন জান? তৎকালীন সমাজের সমস্ত বিদগ্ধ মানুষ-জন। গান-টান হয়ে যাওয়ার পর সবাই মিলে একসাথে বসে খেতাম। বলতে পার, এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারই আমায় গাইতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

শু আপনার গাওয়া গীতবিতানের সবকটি পর্যায়ের গান সমান জনপ্রিয়, কিন্তু 'পূজা' পর্যায়ের গানেই কি আপনি সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ্য? আপনার নিজের প্রিয় গান কোনটা?

শু ঠিকই। 'আমার সকল দুখের প্রদীপ' গানটা আমার খুব প্রিয়।

শু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানে দেশপ্রেমের একটা আলাদা আকুতি আছে। সেই আকুতি আপনাকে কতটা ছুঁয়ে যায়?

শু এই আকুতি আমাকে অবশ্যই ছোঁয়। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে গাওয়া 'বাংলার মাটি' বাংলার জল' গানটা আমার খুব ভাল লাগে। তারপর 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'—এটাও অসাধারণ একটা গান। তবে স্বদেশ পর্যায়ের গানে বিশেষভাবে উল্লেখ করব বাউল অঙ্গের গানগুলোকে। যেমন ধরো 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী', এই গানটা। এর যেমন কথা, তেমনি তার সুর। এই গানগুলো সহজেই লোকের মনকে আকৃষ্ট করে। এগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন দিক খুলে দিয়েছিল।

শু আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার গ্রাম্য-লোক-সংস্কৃতির সুরমূর্চ্ছনাকে কলকাতার এলিট সমাজের ভাষার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন?

শু হ্যাঁ, তাই তো। তাঁর গানের মধ্যে যে বাউল, ভাটিয়ালি সুরগুলো আছে তা সহজেই লোকের মনকে আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ করলেন কি, তাঁর গানের কথাকে ওইসব সুরে বসিয়ে দিলেন। যে কারণে গ্রামের চাষী-মজুর যারা তোমার-আমার ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয়, তারাও কোথাও যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারল। দেখবে তিনি তাঁর গানে সারি গান, ঝুমুর গানের মতো প্রচলিত লোক-সংস্কৃতিকেও কি চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন।

শু আজকের শান্তিনিকেতন আপনাকে ঠিক কতটা কষ্ট দেয়?

শু খুবই খারাপ লাগে। বাঙালীর বোধহয় এটাই সবচেয়ে দুর্বলতা। বিশ্বভারতীর মতো একটা প্রতিষ্ঠান, বিশ্বে যার স্থান সবচেয়ে উচ্চে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বাঙালী নিতে পারল না? আজ নোবেল চুরি হচ্ছে, কাল অ্যালবাম লোপাট হয়ে যাচ্ছে, পরশু জানলা-দরজা খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এতে আমাদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। সারা বিশ্বের সামনে আমরা লজ্জায় পড়ছি।

শু ধরুন রবীন্দ্রনাথ আপনার স্বপ্নে একদিন দেখা দিলেন এবং তিনটে বর দিতে চাইলেন। কি কি চাইবেন?

শু ওসব স্বপ্নে-টপ্নে তিনি আমায় দেখা দেবেন না।

শু এটা কি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনও অভিমান?

শু না, অভিমান কিছু নয়। আমি অতদূর উঠতে পারিনি যে উনি আমার স্বপ্নে দেখা দেবেন। এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাই আমার পক্ষে অসম্ভব।

শু রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য আপনি অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষ কোনও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করতে চাইবেন?

শু হ্যাঁ, পুরস্কার আমি অনেক পেয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের পেয়েছি, রাজ্য সরকারেরও পেয়েছি। তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার কি জান? তোমাদের ভালবাসা। আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে, দর্শক-শ্রোতারা আছেন, এদের ভালবাসা আমার জীবনের পাথেয়। এর মূল্য টাকার চেয়ে অনেক বেশী।

শু আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

শু খুব ভাল লাগল, তোমরা এলে বলে। আবার এসো কিন্তু।

স্বস্তিকা-র পাতায় মগ্ন সুমিত্রা সেন। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

Swastika RNI No. 5257/57
10 May - 2010, Rabindra Sankhya

Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

विकास के निरन्तर
नए आयाम स्थापित करता

हिमाचल प्रदेश

उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- **सामाजिक सुरक्षा पैंशन** 200 से बढ़ाकर 330 रुपये मासिक की।
- **दैनिकभोगी कर्मचारियों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये** की।
- **मातृशक्ति बीमा योजना** के अंतर्गत बीमा राशि में चार गुणा वृद्धि। अपंगता की स्थिति में बीमा राशि 50 हजार तथा मृत्यु होने पर एक लाख रुपये हुई।
- मार्च 2009 तक आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले **अनुबंध व दिहाड़ीदार कर्मियों को नियमित** करने का निर्णय। 28 हजार **दिहाड़ीदार व अनुबंध** कर्मियों की सेवाएं नियमित।
- पंजाब के **पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों** के अनुसार नियमित कर्मचारियों को सितम्बर 2009 से बढ़ा हुआ वेतन प्रदान।
- प्रदेश में 449 **डाक्टरों** व 605 **स्टाफ नर्सों की भर्ती।** पैरामैडिकल स्टाफ के सैंकड़ों पद भरे गए।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** पूरे प्रदेश में आरम्भ। 2,98,291 बी.पी.एल. परिवारों को 30 हजार रुपये का **स्वास्थ्य बीमा छत्र** प्रदान जिसके लिए उनसे कोई प्रीमियम देय नहीं।
- **अटल बिजली बचत योजना** के अंतर्गत 16 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को चार-चार सीएफएल बल्ब मुफ्त वितरित।
- **पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना** के अंतर्गत पॉलीहाउस निर्माण तथा लघु सिंचाई इकाई के लिए 80% तथा सिंचाई स्रोतों के निर्माण के लिए 50% सब्सीडी। बी.पी.एल. परिवारों को पॉलीहाउस निर्माण के लिए 90% सब्सीडी।
- सेब तथा आम **फसल बीमा योजना** के अंतर्गत लाया गया।
- हिमाचल को **शिक्षा हब** बनाने के प्रयास। निजी क्षेत्र में 16 विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य।

सरकार का ध्येय - स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोज़गार